

# একজন মায়ের কথা



রীনা পারভীন

চৈত্রের দীর্ঘায়িত দিবসের  
সমাপ্তি হত রাতের অন্ধকারে ।  
বিরামহীনভাবে সময় বয়ে যেত  
অনাগত ভবিষ্যতের দিকে ।  
সেই অনাগত ভবিষ্যতের কোন  
এক সময়ে শামসুন্নাহার বেগম  
পারলের বিয়ের সালাই বেজে  
উঠবে সে বিষয়ে সকলেই ছিল  
নিশ্চিত । এই শামসুন্নাহার  
বেগম পারল পঁচাত্তর উৎব  
একজন মা, একজন পরিপূর্ণ  
মানুষ । মৃন্ময়ী এ পৃথিবীতে বাস  
করা এই মায়ের পশ্চাত জীবনের  
ফেলে আসা অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ  
জীবনপ্রবাহের বর্ণনায় সাজানো  
এ রচনা । জীবনের অপরাহ্নে  
একজন সুখী মায়ের একজন  
দুঃখী মা-এ বদলে যাবার  
ভারাক্রান্ত ঘটনা এদেশের  
সকল মায়ের দুঃখ, সুখ, কান্না,  
হাসির সাথে এই একজন  
মায়ের দুঃখ, সুখ, কান্না,  
হাসিকে একাকার করে পাঠকের  
সাথে এ মায়ের সেতুবন্ধন তৈরী  
করবে ।

# একজন মায়ের কথা

রীনা পারভীন

প্রকাশনায়।

মোঃ আজমল হোসেন খান  
শিউলি-৪ ইস্কাটন গার্ডেন অফিসার্স কলোনী  
রমনা,  
ঢাকা-১০০০  
বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশ।

ডিসেম্বর, ২০১০

© রীনা পারভীন

প্রচ্ছদ।

মোঃ জাহিদুল হক

ISBN-9789843321350

কম্পিউটার কম্পোজ।

মরিয়ম আকতার

মুদ্রণ।

বর্ণরেখা প্রিন্টিং প্রেস  
১৪৩/১ আরাম বাগ,  
ঢাকা।

মূল্য : দুই শত সতের টাকা মাত্র।

Akjon Mayer Katha [All about a mother] by Rina Parveen,  
Published in 2010 by Md. Azmal Hossain Khan, House  
No-4 Sheuly, Eskaton Garden Officer's Colony, Ramna,  
Dhaka-1000 Bangladesh. Price : Taka Two hundred and  
seventy only.

## উৎসর্গঃ

২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ এ বিডিআর সদর  
দপ্তরের হত্যাকাণ্ডে আমাদের ছেটভাইয়ের  
বাবে যাওয়া সোনার জীবনের উদ্দেশ্যে।

রীনা পারভীন

এক.

একজন মায়ের কথা লিখছি।

আজ থেকে যাট সত্ত্ব বছর পূর্বের সমাজ কাঠামোতে বেড়ে ওঠা মেয়েদের তিনি একজন। সে সব দিনে মেয়েদের জীবনে বিরাজমান বাস্তবতার সবকিছুই সেই মা অনুভব করেছেন, মুখোমুখি হয়েছেন। রোগ, শোক, অভাব অনটন, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, অনুশাসন সব-ই। তবে তিনি বিকশিত হয়েছেন প্রকৃতির অকৃপণ সুধারস ও আপনজনের অক্তিম ভালবাসার মাঝে। বর্তমান নগর জীবনের বেশুমার যন্ত্রনির্ভর গুমোট জীবনের স্বাচ্ছন্দে ভারাক্রান্ত এই মায়ের পশ্চাত জীবনের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে এ রচনা। সাদামাটা জীবনের হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনার ঘটনার বিষয়ে আজকের অন্য কোন মায়ের সাথে এই একজন মায়ের মিল অমিল থেকে থাকতেও পারে।

সময় পার করে করে জীবন এগিয়ে চলে, অতিক্রান্ত সেসব সময়কে ফিরে পাওয়া যায় না, শুধু ফিরে দেখা যায়, আর অনুভব করা যায়। আমার মায়ের অতিক্রান্ত সময়ের স্মৃতিময় শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের সময়গুলো ফিরে দেখার আকুলতা সীমাহীন। জীবনের অগ্রহায়ে ফেলে আসা দিনগুলোতে ফিরে যাওয়া, নিজের সাথে নিজের সংলাপ আর আত্মসাক্ষাৎকারের সুযোগ দিতে আমার মাকে নিয়ে যেতে চাই সেই অতিক্রান্ত সময়ের দরজায়। আমার মাপারুল, রূপকথার সাত ভাইয়ের এক বোন নন, তিনি আমার মা শামসুরাহার বেগম পারুল। বরিশাল জেলার সদর উপজেলার চরহোগলা গ্রামের চৌধুরী বাড়ীতে আষাঢ় মাসের বর্ষণমুখের দিনের কোন এক প্রহরে তিনি পৃথিবীর বাসিন্দা হয়েছেন। জন্মের সঠিক তারিখ বা সময়টা সম্পর্কে কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। তবে চৌধুরী বাড়ীর বড় পুকুর ঘাটের সিঁড়িতে খোদাই করা ১৯৩৬ সাল, আর এই সালেই নাকি আমার মায়ের জন্ম যা তিনি পরবর্তীতে মুখে মুখে মুরব্বীদের কাছে শুনে থাকবেন। চৌধুরী বাড়ীটি মায়ের নানাবাড়ী। মকবুল হোসেন চৌধুরী ভাষানচরের জমিদার পুত্র, তিনি চরহোগলার সিকদার বাড়ীর একমাত্র মেয়েকে বিয়ের সূত্রে চরহোগলায় দ্বিতীয় চৌধুরী বাড়ীর গোড়াপত্ন করেন আর সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এই নানা নানীর সংসারে পাঁচ মেয়ে আর দুই ছেলের জন্ম। বিবাহিত জীবনের অল্পদিনের মধ্যে মকবুল হোসেন চৌধুরী বিপজ্জীক হয়ে পড়েন। তাঁর পাঁচ মেয়ের দ্বিতীয় মেয়ের নাম মাজেদা বেগম। তিনি আমার মায়ের মা জননী। নানাবাড়ীর একান্নবর্তী পরিবারে আমার মায়ের জন্মক্ষণটি সাদামাটা হলেও চৌধুরী বাড়ীর ঐতিহ্য ও

আভিজাত্যের বদৌলতে নবজাতকের আগমনটা বেশ কদর পেয়েছিল। সে যুগে প্রথম সন্তান ছেলে হোক এমন ধারণা যে ছিল না তা নয়। কিন্তু চৌধুরী বাড়ীতে এ নিয়ে তেমন কারো মাথাব্যথা ছিল না বলেই মায়ের কাছে শুনেছি। মা এ কথা বলতে দ্বিধা করেননি যে, প্রথম মেয়ে সন্তান হওয়ার কারণে আমার নানা খোন্দকার আবদুল আলী তৎক্ষণিকভাবে কিছুটা বিমর্শ হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে নবজাতক মেয়েকে নিয়ে আমার নানার বাড়াবাড়ি রকম আদর আছাদ প্রথম মেয়ে সন্তান জন্মের সময়ের হতাশার অনুভূতিকে আর স্থায়িত্ব দেয়নি। আমার মা পারঙ্গ নানাবাড়ীর গভীর মাঝা মমতা আর আদর যত্নে চৌধুরী বাড়ীর ডজন খানেক সমবয়সী মামা খালা আর ভাই বৈনদের সাথে উৎসৱীয় একটা সোনালী শৈশব অতিবাহিত করেছেন। অতিক্রান্ত সেই শৈশবের স্মৃতি রোমছনে আজও কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়েন আমার মা শামসুন্নাহার বেগম পারঙ্গ, যা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে জীবনে বহুবার। শৈশবে মামা ও খালাদের খেলার সাথী হিসেবে পাবার বিষয়টির একটা ব্যাখ্যা রয়েছে। বিপত্তীক মকবুল হোসেন চৌধুরী তাঁর বিরাট একান্নবর্তী পরিবারটির দেখভালে পরাস্ত হয়েই একসময় দ্বিতীয় বিয়েতে সম্মত হন। দ্বিতীয় পক্ষের চার পাঁচজন মামা খালাও মায়ের ছোট বেলার খেলার সাথী হয়ে বড় হয়েছেন। এদের মধ্যে বিশেষ আবেগের স্থানে রয়েছেন শাহানা, সেলিমা, মোশা, আতাহার, নসু ও কাসু। তাদের নাম এখনো মা মনে রেখেছেন। এ সব খেলার সাথীদের মধ্যে কেউ কেউ পরবর্তী জীবনে বেশ সফলতা অর্জন করেছেন, আবার কেউ কেউ পড়েছেন অকালেই। তাদের স্মৃতিকথা প্রাসঙ্গিকভাবেই আসবে আমার মায়ের জীবনালঘু। চৌধুরী বাড়ী অর্থাৎ মায়ের নানা বাড়ীতে অতিক্রান্ত চার পাঁচ বৎসরের শৈশব যেন ভরা নদীর মত আমার মা ও তার খেলার সাথীদের হাসি, গান ও আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। গ্রামের নেসর্গিক প্রাকৃতিক পরিবেশের সেই আবেগময় বাল্য স্মৃতির প্রসারিত দিগন্ত আমার মায়ের পরবর্তী নগর জীবনের স্মৃতিতে বার বার ফিরে এসেছে। সকাল বেলার পাখির কুজন, সবুজ ধানের ক্ষেতে বাতাসের ঢেউ, নদীর বুকে পাল তোলা নৌকায় ভেসে চলা সবই যেন শৈশবের অকৃত্রিম আনন্দের উৎস হয়ে আছে। সব কিছু এখন আর স্পষ্টভাবে মা মনে করতে পারেন না। তবুও এর অস্তিত্ব রয়ে গেছে অন্তরের গভীরতায়।

বরিশাল জেলার সদর উপজেলার বুখাইনগর গ্রামটি আমার মায়ের বাপের বাড়ী। ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের সময় কিছুদিন এ বাড়ীটি আমাদের নিরাপত্তার

দায়িত্ব নিয়েছিল। আর তখন থেকেই এ বাড়ীটির প্রতি অঙ্গ আবেগ হৃদয়ের গভীরে ঠাই নিয়েছে। এ বাড়ীতে মায়ের দাদা খোন্দকার আবুল কাশেম এর অকাল মৃত্যুর পরে দাদীর অভিভাবকত্বে নানারা তিন ভাই বড় হতে থাকেন। আমার নানা খোন্দকার আবদুল আলী ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান। শিক্ষাদীক্ষায় অঞ্চলসরমান একটি সমৃদ্ধ বাড়ী হিসেবে খোন্দকার বাড়ী নামেই আমার নানাবাড়ী সকলের কাছে সুপরিচিত ছিল। নিকনো উঠান, বড়সড় কাছারী ঘর লাগোয়া সবুজ এক টুকরো মাঠ, মাঠের পাশ দিয়ে পায়ে চলা মেঠো পথ আর তার ওপাশেই একটি আঁকাবাঁকা নদী, নদীটির নাম জানা নেই। সব মিলিয়ে একটি অপূরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এ বসতবাটি। চাকুরীর সূত্রে নানার বিভিন্ন জেলায় অবস্থানের কারণে মায়ের এ বাড়ীতে দীর্ঘ সময়ে একসাথে বসবাসের সুযোগ হয়নি। সামাজিকতায় এ বাড়ীর বাসিন্দাদের বেশ নামডাক ছিল বলেও মায়ের কাছে অনেক শুনেছি। আমার নানা খোন্দকার আবদুল আলী উচ্চশিক্ষিত ও সৎ গুণাবলীর অধিকারী একজন সুপুরুষ হিসেবে এ বাড়ীর অহংকার ছিলেন। আমার নানার বর্ণান্য জীবনে সফলতার তালিকা বেশ দীর্ঘ। ছোট বেলা থেকে লেখাপড়ার প্রতি তাঁর দুর্নির্বার আগ্রহ তাঁকে শিক্ষাজীবনে অসাধারণ সফলতা এনে দিয়েছিল। তিনি এন্ট্রাস এবং এফ এ (সম্ভবত First Art) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্র্যাজুয়েশন এবং এম,এ ডিগ্রী লাভ করেন। এসব পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগ অর্জন করেছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্র ছিলেন। এম,এ বি টি ডিগ্রী লাভের পর আমার নানাকে সংবর্ধনা প্রদানের স্মরণীয় ঘটনাটি মা বহুবার আমাদের শুনিয়েছেন। নানাকে এক নজর দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে লোক জমায়েত হয়েছিল খোন্দকার বাড়ীতে। ভালো ফুটবল খেলোয়ার হিসেবেও নানার সুখ্যাতি ছিল। শিক্ষাজীবনে যাঁদের সঙ্গে একসাথে নানা পড়াশুনা করেছিলেন তাদের অনেকেই পরবর্তী জীবনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল তারকা হয়ে উঠেছিলেন। এর মধ্যে আবদুল জব্বার খান অন্যতম যিনি পাকিস্তানের সংসদে স্পীকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

উচ্চশিক্ষিত এবং মার্জিত কুচির ব্যক্তি হিসেবে নানার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বরিশাল ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। পাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন আকর্ষণীয়। পাত্র হিসেবে নানাকে পছন্দের তালিকায় যারা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে চরহোগলা চৌধুরী বাড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ে চরহোগলা চৌধুরী বাড়ীও অর্থ ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে সম্মান ও খ্যাতির শীর্ষে ছিল। তবে চৌধুরী

বাড়ীর সমকক্ষ না হলেও আলাদা মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত শিক্ষাদীক্ষায় অঞ্চলগামী একটি পরিবার হিসেবে খোন্দকার বাড়ীরও সুনাম কোন অংশে কম ছিল না। তাই উভয় পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধনে যেন কোন বাধা ছিল না। আবার অভিথায় অনুযায়ী এম, এ বি টি পড়ুয়া অবস্থায়ই চরহোগলা গ্রামের মকবুল হোসেন চৌধুরীর মেজ মেয়ে মাজেদা বেগম এর সাথে খোন্দকার আবদুল আলী অর্থাৎ আমার নানা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। নানার পড়াশুনা শেষ হবার পূর্বেই এ বিয়ের পর ১৯৩৬ সনে আমার নানার প্রথম মেয়ে অর্থাৎ আমার মা শামসুন্নাহার বেগম, পারল এর জন্ম হয়।

খোন্দকার আবদুল আলী অর্থাৎ আমার নানার পড়াশুনার সমাপ্তির পূর্বেই ১৯৪০ সনে আবারও এক কন্যা সন্তানের জন্ম হলেন আমার নানু মাজেদা বেগম। দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের নাম রাখা হ'ল নূরুন্নাহার বেগম মঙ্গ। দ্বিতীয় মেয়ে সন্তানের আগমনে আমার নানা কতটা বেদনায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন তা পরিমাপের আগেই জীবনের প্রথম চাকুরীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমার নানা বানারীপাড়ার বাইসারী গ্রামে সপরিবারে চলে আসেন। পাল তোলা নৌকায় ডেসে নানার পরিবারটি প্রথম কর্মসূলে যাবার প্রস্তুতি আজ গুধু শৈশবের স্মৃতি। আমার মা ভাল করে সেসব শৈশবের স্মৃতি স্মরণ করতে পারেন না। তবুও বারবার সেই শৈশবে তিনি ফিরে যেতে চান, স্মরণ করতে চেষ্টা করেন সেই সব হারানো দিনগুলোকে। আমার নানার বাইসারীতে জি.টি স্কুলে শিক্ষক হবার বিষয়টি এখনো পরিকারভাবে বুঝে উঠতে পারি না। তখনকার সময়ে বানারীপাড়ার একটি গ্রামে গুরু শিক্ষকের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠার কারণ খুঁজতে গিয়ে অবাক হই। হয়তো নদীপথে তখন যোগাযোগের সুবিধার কারণেই আশেপাশের অঞ্চলগুলো থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যারা ‘গুরু’ নামে পরিচিত তারা প্রশিক্ষণ নিতে আসতেন। আমার নানা সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষক হয়ে তাঁর চাকুরী জীবনের সূচনা করেছিলেন। চাকুরীর প্রথম কর্মসূলে নানা সপরিবারে বাইসারীতে থাকার ব্যবস্থা নেন। চৌধুরী বাড়ীর জমজমাট হটেগোল আর হড়স্তুলে জীবনে অভ্যন্তর পরিবারটি যেন হঠাতে করে শিকড় থেকে বিছিন্ন হয়ে গেল। নতুনত্ব আর ছন্দহীন বাইসারীর আটপৌরে জীবনে আমার মায়ের প্রথম পাঠশালায় যাবার বয়স হয়ে গেল। পাঠশালার প্রথম দিনের কথা এখন আর মনে পড়ে না। হয়তো আমার নানু আমার মাকে কারো সাথে পাঠশালায় পাঠিয়েছিলেন, হয়তো কেউ মাকে আদর করে মোয়া মুড়কী কিনে দিয়েছিল ইত্যাদি কত কাল আগেকার কথা। সব কথা মনে রাখা যায় না। তবে

বাইসারীতে থাকাকালীন দু'একটি ঘটনা মা বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমাদের বর্ণনা করেছেন। মায়ের কাছে শোনা বাইসারীতে ঘটে যাওয়া এমন একটি ঘটনা নানাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল, যিনি চোরদের অবলীলায় পঁচিশ ভরি ওজনের সোনার গহনা নিয়ে নির্বিষ্টে চলে যাবার পরও চুরির বিষয়টি আন্দাজ করতে পারেননি। বিয়ের উপটোকল হিসেবে নানুকে স্বর্ণ দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন মকবুল হোসেন চৌধুরী অর্থাৎ আমার মায়ের নানা। আমার নানা এসব গয়নার সাথে থাকত নানার দু'টি সোনার বোতাম। খাটের নীচের সুটকেশটি থাকত শূন্য। সেদিন চোরেরা রাতের অন্ধকারে সুটকেশটি নিয়ে যাবার পরও নানা বেশ আস্ত্রণির সাথে ঘোষণা দিলেন যে, চোরেরা তাঁর খুব একটা বেশী ক্ষতি করতে পারেনি। ক্ষতি যা হয়েছে তা সামান্য। কিন্তু যখন দেখা গেল বালিশের নীচের বাক্সাটাতে নানুর সোনার গয়নার পরিবর্তে নানার সোনার বোতাম রাখা, তখন বোঝা গেল নানা ভুল করে নানুর গয়নার বাক্সটি সুটকেশে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আর চোরেরা সে সুযোগের সম্ভবহার করে নানুর সব গয়না নিয়েই চম্পট দিয়েছিল। ১৯৪৩ সালে বাইসারীতে আমার নানার প্রথম ছেলে সন্তানের জন্ম প্রাহ্ণের ঘটনা এখানে বসবাসের দেড় বৎসরের সময়কালকে শেষতক স্মরণীয় করে রাখল। ছেলের নাম রাখা হল খোন্দকার সিরাজুল ইসলাম আবু। আবু মায়া আমাদের বড় মায়া। তিনি যথার্থই সুপুরুষ, সুশিক্ষিত এবং শিল্পবোধসম্পন্ন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হিসেবে বহুদিন চাকুরী করেছেন। সেই বড় মায়ার জন্ম উপলক্ষে আমার নানার গ্রাম জুড়ে মিষ্টি বিতরণের ঘটনা আজও আমার মায়ের মনে বেশ তরতাজা। তখন তার বয়স কতইবা, বড়জোর আট নয় বৎসর মাত্র। যখন তাল পাতায় হাতে খড়ি দিয়ে আমার মায়ের পাঠশালায় যাবার প্রস্তুতি চলছিল।

আমার নানার বদলীর চাকুরী। সম্ভবত ১৯৪৪/৪৫ সনের দিকে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় চাকুরীর সুবাদে তিনি বৎসর বসবাস করেছিলেন। জীবনের কিছু কঠিন বাস্তবতার সাথে মুখোমুখি হবার শুরুটা যেন এখানেই শুরু হয়, এই মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরের সময়টাতে আমার নানুর বাবুবাবা অসুস্থতা আমার ঘাকে সংসারের ছোটখাট দায়িত্ব পালনে আপনা থেকেই প্রস্তুত করে তোলে। নানুর শরীর যেন অনেকটা কাবু হয়ে পড়ে এখানে। নানুর শারীরিক অসুস্থতার পিছনে অবশ্য একটি বড় কারণও ছিল। সে

কারণটির সূত্রপাত ঘটেছিল মেদিনীপুর যাত্রার তিন চার মাস আগে। নতুন কর্মস্থল মেদিনীপুরে যাবার আগে নানা সপরিবারে প্রিয় বসতবাটিতে কিছুটা সেই সুখ স্বপ্নটা মুহূর্তেই দুঃস্বপ্নে রূপ নেয়। সেই সময়ে আমার নানু গুটি বসন্তের মত ভয়াবহ মহামারী রোগের যন্ত্রণায় বুধাইনগরের সেই খোদকার রাখা হয় পুরো তিন চার মাসের জন্য শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। নানুকে বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে পুরো তিন চার মাসের জন্য শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। নানুকে পার্ক, মঞ্জু আর আবুকে ছোঁয়াচে রোগের ছোঁয়া থেকে দূরে নানাবাড়ী অর্থাৎ চরহোগলায় চৌধুরী বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মা বিহীন নানাবাড়ীর সেই আগের আনন্দ মিলিয়ে যায় সহসাই। তিন ভাই বোনের বুকের কাছে দলা আগের আনন্দ মিলিয়ে যায় সহসাই। আমার পাকিয়ে থাকে শুধু কান্না-মায়ের জন্য, হারিয়ে যাওয়া সব কিছুর জন্য। আমার নানু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হতে নানুর আরো বিশ্রামের প্রয়োজন এ উপলক্ষি থেকেই প্রিয় ভাবীর মেদিনীপুর যাবার বিপক্ষে কঠিন আপত্তি তুলেছিলেন তার দেবর অর্থাৎ মায়ের ছোট চাচা খোদকার আবদুল করীম। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় তাঁর আপত্তি টিকে থাকেন। নানা সপরিবারে খুলনা হয়ে ট্রেনে মেদিনীপুরে চলে গেলেন।

মেদিনীপুরের জীবনটা ছিল সবার জন্য ঘটনাবহুল। জীবনের দুর্লভ কিছু সময়ের স্মৃতিচারণে আজও আমার মা কত না সপ্রতিতি। মেদিনীপুরে আমার নানু প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। ঘরের ভিতরে তাঁকে দেখাশুনার তেমন কেউ ছিল না। নানুর সেবাযত্তের জন্য তখন আমার মায়ের বয়স যথেষ্ট ছিল না। তবে মা নানুর রোগ যন্ত্রণার কষ্ট শুধুমাত্র উপলক্ষি করতে পারতেন এবং তাঁর মাকে আরাম দেবার চেষ্টা করে যেতেন। এমন অনেক ঘটনার কথা মায়ের মুখে শুনেছিলাম। মায়ের মুখে শোনা এমন একটি ঘটনা আমার মাকে নিয়েই। দূরের অজানা বাড়ী থেকে ভেসে আসা নেহারী রান্নার স্বান আজও আমার মাকে মনে করিয়ে দেয় তার অসুস্থ মায়ের নেহারী খাবার স্বান পূরণে তিনি কতটা সাহসী হয়ে উঠেছিলেন। পায়ে হেঁটে দূরের গেরছ বাড়ী থেকে কিনে এনেছিলেন গরম গরম নেহারী আর বড় বড় চাপাতি। যা ছিল ওখানকার ঐতিহ্যবাহী একটি খাবার। আতা ফল নিয়ে এরকম আরো একটা ঘটনা আছে। যে ঘটনায় আমার মা অনেক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন গাছে ঝুলে থাকা একটি মাত্র পাকা আতা ফল হস্তগত করার জন্য। অভিনব কৌশল প্রয়োগ করে পাকা আতাটি পেড়ে এনেছিলেন আমার মা তাঁর অসুস্থ মায়ের জন্য। মেদিনীপুরে

মায়ের স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেই স্কুল জীবনের স্মৃতিটুকু মোটেই সুখকর ছিল না। স্কুলে হিন্দু আর মুসলিম ছাত্রীদের জন্য বসার পৃথক বেঞ্চ রাখা হত। মুসলিম ছাত্রী হিসেবে তিনি আলাদা বেঞ্চে বসতেন। সবার মধ্যে তিনি আলাদাভাবে বসার মনোকণ্ঠের কথা আজও মনে রেখেছেন। পাড়া প্রতিবেশীর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েও কত না বিধি নিষেধ মাকে মানতে হত। বিড়িভনার শিকারও হতে হয়েছে কয়েকবার। সেসবের কোন কারণ বুবাতে পারেননি মা সেই সময়টিতে। তবে মানুষে মানুষে এসব পার্থক্যের কারণটি পরিষ্কার হতে বেশী সময় লাগেনি যখন মেদিনীপুরের আকাশ বাতাস, চিরচেনা স্কুল থেকে বিদায় নেবার ফুসরত ছাড়াই প্রাণ ভয়ে পালাতে হয়েছিল মেদিনীপুর ছেড়ে ১৯৪৫ সনে। যখন হিন্দু মুসলমানের রায়ট প্রকাশ্যে ঝুপ নিয়েছিল তখন হঠাৎ করেই মেদিনীপুরে বাস করা বিপদসংকুল হয়ে পড়ল। বিদায়ী ভাবাবেগের পরিবর্তে ভয়, আতঙ্ক আর পালিয়ে আসার বিভীষিকার কথা স্মৃতিচারণের একটি বড় জায়গা দখল করে আছে আজও। রায়টের এই ভয়াবহ দিনগুলোতে মেদিনীপুরে বসবাসরত মুসলিম পরিবারগুলোর ঐক্যবদ্ধতাবে পরিস্থিতি যোকাবেলার প্রস্তুতি এবং সাহসীর মত মৃত্যুকে বরণ করার অঙ্গীকার আমার মায়ের ছেট মনে অঙ্গুত প্রতিক্রিয়ার জন্য দিয়েছিল। মুসলিম পরিবারগুলোকে বিপদ থেকে রক্ষার জন্য নানার সক্রিয় ভূমিকা আমার মায়ের বাল্য স্মৃতিতে আবছা আলো ছায়ায় আজও লুকোচুরি খেলে। বিশেষ করে সব মুসলিম পরিবারগুলো যখন তিন দিনের ট্রেন যাত্রার দুর্ভেগ মাথায় নিয়ে মেদিনীপুর থেকে পালিয়ে আসার যাত্রা শুরু করে। পালিয়ে আসার সেই যাত্রায় প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশংকায় পরিবারগুলোর মানসিক অবস্থা ছিল ভয়াবহ। কিন্তু বড় ধরনের কোন বিপদ ছাড়াই খুলনায় এসে পৌছায় সেই ট্রেন। সমাপ্তি ঘটে মেদিনীপুরের সাথে জীবনের সকল সংযোগ। এ সবই আজ বিস্মৃতির অতলে ছিলিয়ে থাকা খণ্ড খণ্ড নাটকের দৃশ্যের মত মনের জানালায় উঁকি দিয়ে যায়। এরই মধ্যে আরো অতিবাহিত হয়ে গেছে সন্তরাটি বৎসর। সময়গুলো শুধু মেঘের মত ভেসে চলে। থেমে থাকেনা, শুধু থাকে কথা আর স্মৃতির পর্বত।

আমার মায়ের ছেট ভাই খোন্দকার শফিকুল ইসলাম, কবীর যিনি আমার ছেট মামা কবীর মামা, মেদিনীপুর থেকে ফেরার সময় তার বয়স মাত্র দশ মাস। কবীর মামার জন্য মেদিনীপুরে সন্তুষ্ট ১৯৪৫ সালে। ছেট ছেলের জন্যের পর থেকে নানুর অসুস্থতা বাঢ়তে থাকে। অসুস্থ মায়ের ঝুঁঁ ছেলে ছেট আমার ভাগ্যে মেহ মায়া মমতার ঘাটতি ছিল সঙ্গত কারণেই। যে ঘাটতি তার সারা

জীবনেও আর পূরণ হয়নি। নানুর অসুস্থতার কারণে জন্মালগ্ন থেকেই তিনি ছিলেন আদর যত্ন বঞ্চিত শিশু। ছোট বেলা থেকেই তিনি ভীষণ অস্থির আর ছটফট স্বভাবের ছিলেন। পরবর্তী জীবনে এই মামার হাসির গল্পে আমরা সবাই দমফটা হাসিতে ফেটে পড়তাম। স্মার্টনেস আর ইংরেজীতে অনৰ্গল কথা বলায় পারদর্শী এ ছোট মামা অসাধারণ তাঁর মেধার কারণে। তিনি যশোর বোর্ডে এস.এস.সি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলেন। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যিনি ছিলেন সেরা। একদা গ্রামের স্কুলে সখ করে ছাত্রদের অংক প্রতিযোগিতায় যিনি ছিলেন সেরা। একদা গ্রামের স্কুলে সখ করে ছাত্রদের অংক করাতে গিয়ে যিনি একদিনেই ছাত্রদের চোখের মনি হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে অপরিপক্ষতাও ছিল ক্ষমাহীন। হঠাতে ভালবেসে বিয়ে করা, পড়াশুনা বন্ধ করে এক উচ্চাভিলাষী জীবনের পিছনে ছুটতে গিয়ে শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একজন মানুষ তিনি। শিকড়হীন এই মানুষটি আর লক্ষ্যে পৌছাতে পারেননি। জীবনের প্রশংস্ত পথটি সরু হতে হতে এক পর্যায়ে মিলিয়ে গেছে সব সন্তানের নিয়ে। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই অসীম সন্তানাময় একটি জীবনের সমাপ্তি ঘটে অসময়ে। ছোট মামার ছোট ছোট স্মৃতি রোমস্থলে শুধু আমার মা নন, আজ আমরাও তার সঙ্গী সমভাবে। কখনো বোন, কখনো বা মায়ের ভূমিকায় শামসুন্নাহার বেগম পারল ছোট ভাইয়ের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। নানুর অসুস্থ অবস্থার সময়গুলোতে ছোট মামার সব দায়িত্ব আমার মাঝে বহন করে আসছিলেন। মেদিনীপুরে ছোট ভাইকে দুধ খাইয়েছেন রোদে কিংবা হারিকেনের তাপে গরম করে। মায়ের ভাষায় তার ছোট ভাইটি যেন বেলী ফুল, যিনি সুগন্ধ ছড়িয়েছেন সবাইকে। কিন্তু তার নিজের জীবনের রঙ ছড়াতে পারেননি। আমার মায়ের জীবন থেকে দূরে, বহু দূরে চলে যাবার পর থেকেই সত্যিকারের ভাঙ্গন যেন দ্রুত ছোট মামার জীবনকে হাস করতে থাকে। সে সব কথায় ফিরে আসব পরে।

নানাকে আমরা দেখেছি খু-ব-ই ছোটবেলায়। বছর তিনেক হবে হয়তো তখন আমাদের বয়স। নানার যে অবয়ব চোখের সামনে রয়েছে সেখানে তিনি সন্তানদের প্রতি মেহশীল ও মনোযোগী এক পিতা। তিনি কর্তব্যপরায়ণ একজন সরকারী চাকুরীজীবি। সেরা ফুটবল খেলোয়ার, হাসিখুশী ভরা এক প্রাণখোলা মানুষ আমার নানা যিনি সংসার যুদ্ধে সফল একজন হিরো। তাঁর গল্প শুনতে শুনতে অন্তরের গভীরে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা অনুভব করি। তাঁর সুখের নীড়ের মেয়াদ ছিল ক্ষণস্থায়ী। ১৯৪৬/৪৭ সালের দিকে চাকুরীতে ঘন ঘন

বদলীর কারণে নানুকে অসুস্থ অবস্থায় চরহোগলা বাপের বাড়ীতে আর তিনি সন্তানকে বুখাইনগর দাদাবাড়ীতে রেখে কর্মসূলে থাকতে হয়েছিল নানাকে। পরম্পর বিছিন্নভাবে থাকার কারণে পরিস্থিতি সব সময়েই নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যেতে লাগল। সেসময় অসুস্থতার বাড়ীবাড়ির কারণে নানুর পক্ষে ছোট ছেলে কবীরের লালন পালন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। মৃত্যু চিন্তায় নানু তাঁর ছোট ছেলে কবীরের জন্য একটি বিকল্প মায়ের কোল খুঁজে ফিরতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত দশ মাসের অসুস্থ ছোট মামাকে নানু দান করে দেন তাঁর প্রিয় ছোট জাকে। চাচীর দুধ খেয়েই শেষ পর্যন্ত আমার ছোট মামার জীবন রক্ষা পেয়েছিল বলে পরবর্তীতে মায়ের কাছে জেনেছি।

ঝালকাঠিতে চাকুরীর অবস্থায় স্ত্রী সন্তানদের সাথে যোগাযোগের জন্য নানাকে বেশ কষ্ট করতে হত। নদীপথে লঞ্চ ছিল বাহন, কখনোবা নৌকায় ভ্রমণ করতে হতো। এরকমই কোন এক শীতের সময়ে সবাইকে কর্মসূল ঝালকাঠিতে, নিয়ে যাবার সব প্রস্তুতি শেষে নানা যখন শঙ্গরালয় চরহোগলায় উপস্থিত ঠিক তখনই আমার নানুর মৃত্যুদূত শিয়ারের অতি নিকটে। নানু মারা গেলেন। নানুকে কবর দেয়া হল তাঁর মায়ের পাশে। আমার মায়ের কাছে আরো জেনেছিলাম নানুর মা যখন মারা যান নানু তখন খুব ছোট। কিন্তু আমার নানুর নানু তখনও জীবিত ছিলেন। একই ভাবে আমার মাকে ছোট রেখে আমার নানু মারা যান। পিছনে রেখে যান মাতৃহীন চার অবুবা সন্তান আর নিঃসঙ্গ স্বামী। সেই সাথে সামনে থাকল এক অনিচ্ছিত ভবিষ্যৎ। সেই মুহূর্তে পুরুর ঘাটে বসে থাকা মায়ের কানে কানে কে যেন বলে গেল তোমার মা আর বেঁচে নেই, যে কথাটি বার বার আমার মায়ের কানে প্রতিধ্বনিত হতে হতে এক সময় মনে হল কথাটি সত্য এবং এটিকে আর বদলানো যাবে না। তখন বুকের মধ্যে এক মরুভূমির অস্তিত্ব আবিক্ষার করলেন শামসুন্নাহার বেগম পারল, আমার মা। সেই মরুভূমি কখন, কিভাবে সবুজ বাগানে বদলে গেল, সে গল্প অনেক পরের, সেই গল্পে পরে আসছি। নানাকে ফিরে আসতে হল কর্মসূল ঝালকাঠিতে। তবে একা নন, সঙ্গী হলেন তাঁর মা (আমার মায়ের দাদী) এবং চার মাতৃহীন সন্তান। কিন্তু কর্মসূলের উদ্দেশ্যে বুখাইনগর থেকে বিদায়লগ্নে ঘটল নতুন বিপত্তি। মায়ের সেই ছোট চাচী যিনি আমার ছোট মামাকে পুত্র হিসেবে পাবার অধিকার পেয়েছিলেন আমার নানুর কাছে, তিনি পরম নিশ্চিন্ত মনে ছোট মামাকে কোলে নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন সবাইকে বিদায় জানাতে। কিন্তু ঠিক তখনই আমার দশ এগার বৎসরের মা বেঁকে বসলেন এবং সাফ জানিয়ে দিলেন, ছোট ভাই

কবীরকে ছাড়া কোথাও যাওয়া হবে না তার। সকল কলরব থেমে গেল, কান্নায় ভেঙে পড়লেন চাচী। মনে হ'ল এ যে নাড়ীর টান-একটি ভাইকে পাবার জন্য বোনের দাবী। এ দাবীকে উপেক্ষা করার সাহস পেলেন না আমিরুন্নেছা বেগম। ভাইকে ফিরে পেলেন বোন অর্থাৎ আমার মা। নাটকের দৃশ্যের মতই বেগম। ভাইকে ফিরে পেলেন বোন অর্থাৎ আমার মা। সংসারের এমন কতশত বন্ধনে আমরা দৃশ্যটা আমি বার বার কল্পনায় দেখি। সংসারের এমন কতশত বন্ধনে আমরা আবদ্ধ। তবে এসব বন্ধনের স্থায়িত্ব কতটুকু তা তলিয়ে কেউ দেখি না। আপন সম্পর্কগুলো শিথিল হয়ে যায় কারণে অকারণে, অমোঘ সত্য এসে দাঁড়ায় কত নিঃসংকোচে। কত শক্ত ইচ্ছে নিমিষেই মরে যায় মনের গভীরে। আমার মা, তিনিও বার বার সবাইকে শক্ত বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থার কারণে বন্ধনগুলো শিথিল হয়ে মাকে করেছে একাকী।

বালকাঠি থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে নানা আবারও বদলী হলেন ফরিদপুর। সেখানে সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা হ'ল। সংসারের শ্রীবৃন্দি না ঘটলেও টেনেটুনে এগিয়ে চলছিল সংসার যত্নটি। কিন্তু ছেলের সংসারের দায়িত্ব পালনে মায়ের দাদী যেন অস্থির হয়ে উঠতে থাকেন। ফিরে যেতে চান নিজ বসতবাটিতে। জোড়াতালি দিয়ে তো একটি পরিবার চলতে পারে না। সংসারের তেল নুনের হিসাব থেকে সন্তানদের লালন পালন, পড়াশুনা, আবেগ অনুভূতি ইত্যাদি সব কিছুতেই তো ভারসাম্য বজায় রেখে সামনে চলতে হয়। সেখানে পরিবারের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে যিনি চাকা ঘোরাবেন তার অনুপস্থিতিতে সব কিছু ঠিকঠাক চলবে এমন আশা করাটাও যেন বেমানান। মায়ের সেই টুকটুকে সুন্দরী দাদী আকার ইঙিতে ছেলেকে (আমার নানাকে) বুঝাতে চাইলেন তাঁর ভবিষ্যতের সমস্যাগুলোকে, বিদেশ বিভূতিয়ে ছেলের সংসারের দায়িত্ব থেকে ফিরে গেলেন তিনি নিজ বসতভিটা বুখাইনগরের খোন্দকার বাড়ীতে। সব দিক বিবেচনায় আমার নানার দ্বিতীয় বিয়ে ব্যতীত আর কোন বিকল্প পথ সামনে উন্মুক্ত রইল না। তবে নানার সামাজিক পদমর্যাদা তাঁর দ্বিতীয়বার বিয়ের বিষয়টিকে প্রভাবিত করেছে বহু দিক থেকে। বরিশালের অদূরে মহাবাজের নাজির বাড়ীর গোলাম রহমানের সুন্নী ঘেয়ে কোহিনুর বেগম এবার খোন্দকার বাড়ীর দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী হয়ে সংসারের হাল ধরলেন। তিনি মেহেলী মা হিসেবে সবাইকে আপন করে নিলেন। আমার মায়ের সাথে তাঁর বয়সের পার্থক্য বড় জোর পাঁচ ছয় বৎসর হয়ে থাকতে পারে। হঠাৎ থেমে যাওয়া নানার সংসারের চাকা সচল হয়ে উঠলেও এর ভিতরের কাঠামো যাতে মজবুত হয়ে গড়ে ওঠে সেজন্য নানা সন্তানদের পড়াশুনা, খাওয়া দাওয়া আর

বিনোদনের সকল বিষয়ে ছিলেন সদা জগত, অতন্ত্র প্রহরী। পরিবারের সকলের ভাল মন্দ তিনি লক্ষ্য করতেন গভীরভাবে। পরিবারে সব সময় একটি সুন্দর ভারসাম্য বজায় রাখতে সফল হয়েছিলেন নানা। এসবই সম্বুদ্ধ হয়েছে নানার দৈর্ঘ্য, সহনশীলতা আর ভালবাসার অপরিসীম ক্ষমতা গুণে। দ্বিতীয় পক্ষের আরো চার সন্তানসহ একটি বড় পরিবারের সুখ দুঃখের মধ্যেই বড় হতে থাকেন আমার মা। এরপর আবার স্থান পরিবর্তন। ফরিদপুর থেকে গোপালগঞ্জ। নানার কর্মসূল পরিবর্তনের অর্থই হল তাঁর পরিবারের অনেক কিছুর পরিবর্তন। ঘন ঘন পরিবর্তন যেন একটি নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নানার কর্মসূল পরিবর্তনের কারণে ছেটবেলা থেকেই চার ভাইবোনের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের মানুষ, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে থাপ থাইয়ে চলতে চলতে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ সম্বুদ্ধ হয়েছিল। আবার ছেট বড় পরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতেও আমার মা এবং অন্য সবাই বেশ অভ্যন্তর হয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই নানার কর্মসূল পরিবর্তনে ধকল থাকলেও তা কোন কোন দিক থেকে সন্তানদের বড় হওয়ার প্রক্রিয়াকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে নানা উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নারী শিক্ষায় তাঁর অনাগ্রহের কারণ খুঁজে পাইনি। গোপালগঞ্জেই আমার নানার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শামসুন্নাহার বেগম পারলের পড়াশুনার পর্বতি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। এ ধরনের পরিবর্তন মেনে নেয়া কঠিন। আমার মায়ের পড়াশুনার পাট চুকে যাবার পিছনে নানার কর্মসূল পরিবর্তনের প্রভাব কতখানি ছিল সে হিসেবে এখন আর কোন লাভ নেই। তবে নানা গোপালগঞ্জে বদলী হবার পর মা আর স্কুলে যেতে পারেননি। এ পরিবর্তন মাকে মেনে নিতে হয়েছিল হয়তো ছেটভাই কবীর এর দেখভালের জন্য কিংবা নানাকে সময় অসময় সংসারের বাড়ি ঝাপ্টা থেকে রক্ষা করার জন্য। গোপালগঞ্জের ভাড়াটিয়া বাসার ঝুল বারান্দা থেকে বন্ধু যুথিকা আর বিথীকার স্কুলে যাবার দৃশ্য আজও মায়ের স্মৃতিতে ভাস্বর। ঝুল বারান্দা থেকে তিনি নীরবে ফিরে এসে দাঁড়াতেন ছেট ভাইটির সামনে, মেনে নিতেন পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবার মত একটি কঠিন পরিবর্তনের ঘন্টাকে। নিজেকে প্রবোধ দিতেন এই বলে ছেট ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে কিছু একটা বানিয়ে ফেলবেন তিনি। স্বপ্ন দেখে দেখে আমার মা বড় হতে থাকেন আর নানা নিশ্চিত হতে থাকেন তাঁর সংসারের নিরবচ্ছিন্ন চলার গতিতে যেখানে তাঁর প্রথম স্ত্রী মাজেদা বেগমের প্রতিবিষ্ফে দেখতে পান তিনি নিজ কন্যাটির সব কিছুতে। আস্থা আর নির্ভরশীলতার একটা বিশ্বস্ত স্থানে পরিণত হতে থাকেন আমার মা সবার কাছে। তবে নানার প্রতি মায়ের অভিমান

থেকে থাকতে পারে যখন ছোট বোন মঙ্গুর লেখাপড়ার বিষয়েও তাঁর অনাধিহ দৃশ্যমান হতে থাকে বিভিন্ন যুক্তিতে। কিন্তু ছোট মেয়েটির পড়াশুনার আগ্রহ নানার অনাধিহের মাত্রাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং তিনি উচ্চশিক্ষা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় পরবর্তীতে নানার উপলক্ষ্যতে নারী শিক্ষার গুরুত্বের বিষয়টি ছাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। গোপালগঞ্জে নানার চাকুরীর বয়স পাঁচ বৎসর। এখানকার মধুমতি নদীর তীরে ভাড়া বাসাটি যেন খুব আপন হয়ে গিয়েছিল। যুথিকা আর বিথীকার মত বাক্সবী যারা আমার মায়ের গান শেখার গোপন স্থাটি নানার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল, মাকে স্কুলে পাঠ্যাবার ব্যাপারে তাদের তদবিরও কর্ম ছিল না। যুথিকা আর বিথীকার বড় ভাই তখনকার পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সংস্কৃতিমনা ও প্রগতিশীল এ পরিবারটিকে মা খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। এমন কি যুথিকার বদৌলতে তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের রহমানকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার মায়ের। এ ঘটনাটি মায়ের মুখে বেশ কয়েকবার শুনেছি। এছাড়াও গোপালগঞ্জের সেই পুতুল নামের মেয়েটির কথা এখনো বাপসা হয়ে মায়ের স্মৃতিতে লেগে আছে। ব্রাক্ষণ বনেদী পরিবারের এই মেয়েটির বাবা দীর্ঘ দিন অস্বল রোগে ভোগার পর যখন মারা যান, তখন পুতুলের মা অস্তঃসত্ত্ব আর ছোট ছোট তিন চার সন্তানকে নিয়ে যে অবর্ণনীয় দুর্দশায় পড়েছিলেন আর বেঁচে থাকার জন্য সেই মহিলাকে যে লড়াই করতে হয়েছিল, সে দৃশ্য মা এখনো মনে করতে পারেন। সব কিছুই যেন তরতরিয়ে এগিয়ে চলছিল এ গোপালগঞ্জে। এমন কি আমার মায়ের জীবনও। গোপালগঞ্জে মায়ের বয়স তখন বার তের বৎসর হবে। সামান্য কোকড়ানো চুলের মেয়েটি আমার মা যিনি ছোট বেলায় নিতান্তই গোবেচারা সহজ সরল স্বভাবের ছিলেন। তাকে সবাই পছন্দ করতেন। বিশেষ করে মাতৃহীন একটি ছোট মেয়ে যখন নিজের খেলার বয়সে ছোট ভাইকে দেখতালের দায়িত্বে হিমসিম থেকে থাকে তখন তাঁর প্রতি সবার মেহেটা যেন আপনা আপনিই বাড়তে থাকে। সবার সাথে মায়ের পার্থক্য তো অবশ্যই একটা ছিল। তাঁর বয়সী আশে পাশে সবার মা থাকল, আমার মায়ের মা থাকল না, তিনি মায়ের আদর ভালবাসা পেলেন না, তিনি আবদার করতে শিখলেন না, তাঁর দুবেণী বেঁধে দেয়ার জন্য কেউ জোড়াজুড়ি করেনি। এমন সব ইচ্ছাগুলো মনের মধ্যে পুরো রেখেই তিনি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন ভাই বোনদের জন্য আর তাদের ভালবাসার মাঝে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন নিরস্তর। আমার মাকে কখনো খুব বেশী মাত্রায় আবেগপ্রবণ হতে দেখিনি। গল্লের বইয়ের পোকা হয়ে তিনি

স্পুবিলাশী হয়েছিলেন সত্য। কিন্তু সংসারের তেল নুনের হিসাবের খাতা থেকে কল্পনার জগৎকে আলাদা রাখার কৃতিত্ব আমার মায়ের অতিরিক্ত যোগ্যতা বৈকি। গোপালগঞ্জে আমার মায়ের কৈশোরের সোনালী দিনগুলো শেষ হতে না হতেই নানা ভোলায় বদলী হন Inspector of School পদে পদোন্নতি পেয়ে। তখন ছোট আমার বয়স বড় জোর পাঁচ বৎসর। গোপালগঞ্জের পাঁচ বৎসরের স্মৃতি নিয়ে নানার সপরিবারে ভোলায় আগমন। গোপালগঞ্জের অনেক কথাই মায়ের স্মৃতিতে ভীড় করে আছে। বাঙ্গী যুথিকা ও বিথীকার সুমধুর সাহচর্য, নদীর ঘাটে নিত্যদিন কত মানুষের আসা যাওয়া, পাড়া প্রতিবেশীদের চেনামুখগুলো সব ছেড়ে ভোলায় চলে আসা ছিল খুব কষ্টের। পাঁচটা বৎসরের আপন প্রকৃতি, পরিবেশ আর নিকটজনেরা যেন নিমিষেই মিলিয়ে গেল দূরে কোথায়, আর হয়তো তাদেরকে এমনভাবে পাওয়া যাবে না এ জীবনে। সময়কে অতিক্রম করে এভাবে এগিয়ে যাওয়ার নামই জীবন। এভাবে প্রতিটি জীবনই কোন এক সময় শেষ গত্তব্যে পৌছে যায়। চলার পথে আরো অনেক জীবন, অনেক বন্ধন, আর অনেক কথা জীবনের সাথে যুক্ত হতে হতে জীবনকে করে তোলে অর্থবহু ও ভারী।

নতুন জায়গাটা বড়ই অসার আর রুক্ষ। মেলামেশার কেউ নেই চারপাশে। একটা বিষাদগ্রস্ত অনুভূতি আর মন খারাপ লাগা মন নিয়ে আমার মায়ের কৈশোরের শেষ প্রান্তে নানার অফিস সংলগ্ন টিচার এসোসিয়েশন ভবনের পিছনে একতলা টিনসেড বাড়ীতে নানার পরিবারটির থাকার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হ'ল। মায়ের ঘৌবনের সূচনা লগ্নের সূচনাও এখানেই। এ সূচনা লগ্নে আমার মায়ের কল্পনাবিলাস মনটি হাজার স্বপ্নে বিভোর থেকেও ছোট ভাইবোনদের বড় হতে থাকার চলমান গতিকে নির্বিঘ্ন রাখতে ছিলেন বাস্তববাদী। এভাবেই মায়ের সন্তায় বাস করা কল্পনা, স্বপ্ন আর বাস্তবতা একত্রে মিলেমিশে আমার মায়ের ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র্য ইমেজ তৈরী হয়েছিল। আমার মায়ের মা বেঁচে থাকল না বলেই তাঁর বয়সী অন্যদের থেকে তিনি আলাদা হলেন, নিজেকে ভালবাসলেন নিজের মত করে, মায়ের ভালবাসার অভাব পূরণ হল অসহায়কে ভালবেসে, প্রকৃতির রঙ বদলানোর খেলা যেন তাঁর মন রাঙানোর খেলায় রূপ নিল। মা থাকল না বলেই অনেক মায়ের ভালবাসায় সিক্ত হলেন আমার মা। এক সংক্ষার মুক্ত সত্য ও সুন্দর পরিবেশে জগৎ সংসারের জটিলতা, বক্রতা আর কপটতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে বড় হতে থাকেন আমার মা। দেখতে দেখতে মায়ের বয়স ঘোল সতের এর কোঠায় পৌছে গেলে তাঁর বিয়ের ছিটেফেঁটা

আলাপচারিতা শুরু হয়ে গেল। মাতৃহীন চৌধুরী বাড়ীর নাত্নী এবং খোদকার বাড়ীর মেয়ে হিসেবে আমার মায়ের বাড়তি কদর ছিল। তবে মায়ের বিয়ের আলোচনাগুলো থেমে থেমে অঙ্গসর হচ্ছিল। এ নিয়ে সবার মনে একটু আধ্যাত্মিক অস্বস্তি ছিল। তবে নানার উচ্চ পদস্থ সরকারী চাকুরীর সুবাদে আমার মায়ের একটি ভালো বিয়ে হবে এমন আশা সবার মধ্যেই বহাল ছিল। একজন সরকারী কর্মকর্তার মেয়ে হিসেবে আমার মায়ের বড় হয়ে ওঠায় স্বাতন্ত্র্য ভাব থাকায় তাঁর কাঁধে সংসারের দায়িত্ব যাই থাকুক না কেন জীবনযাত্রায় একটা স্ট্যাভার্ড সব সময় বজায় রয়েছে। সংস্কৃতি চর্চা, বইপড়া, গান শোনা কিংবা আধুনিকতায় এগিয়ে থাকা শহুরে চালচলনে অভ্যন্তর ছিলেন আমার মা। নানার পরিবারে শৃংখলা ছিল। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল প্রথম। এ সবই সম্ভব হয়েছে শিক্ষাদীক্ষার ক্রমাগত চর্চা, বৎশর্মর্যাদা, নানার বিভিন্ন স্থানে চাকুরীর কারণে বহু পেশার ও শ্রেণীর মানুষের সাথে মিথিক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টির কারণে। বহির্জগত, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা লাভ সম্ভব হয়েছে। নানা ছিলেন আমার মায়ের সামনে একটি মডেল। মাঝেরাতে হঠাত সন্তানের কানায় বা অসুস্থতায় ছুটে আসা, রান্নাঘরে প্রয়োজনে নানুকে সাহায্য করা সে সব দিনের প্রাকটিস না থাকলেও নানা এসব কাজে কখনো অনীহা প্রকাশ করতেন না। পরিবারটি পুরুষ নিয়ন্ত্রিত হলেও এখানে স্বামী স্ত্রী কিংবা ছেলে মেয়েরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। পরিবারে নানা নানুর কোন বিষয় নিয়ে মতান্বেক্য দেখা দিলে নানা হাসিমুখে রণে ভঙ্গ দিতেন। নানুকে জিতিয়ে দিয়েই তিনি আনন্দ পেতেন। সংসারের যাবতীয় দায়িত্বাবলী শুধু মহিলাদের উপরে চাপানোটা সুবী পরিবারের সংজ্ঞায় বড় বেমানান-এমন ধারণা সে সময় থেকেই আমার মায়ের চেতনায় ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। এমনই একটি পরিবারের বড় মেয়ে হিসেবে শামসুন্নাহার বেগম পারফুল এর বিয়ের পাত্র নির্বাচনের বিষয়টি বেশ গুরুত্ব সহকারে চিন্তা ভাবনার মধ্যে রাখা হয়েছিল। অল্প বয়সে মেয়েদের উপযুক্ত পাত্রে পাত্রস্থ করা ছিল তখনকার দিনের একটি প্রচলিত সামাজিক রীতি। মেয়েদের বয়স একটু বাড়ত হলেই এ নিয়ে পাড়া প্রতিবেশীদের যেন চিন্তার অন্ত থাকত না। কখনো কখনো এটি একটি মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে যেত। বর্তমান প্রজন্ম এসব নষ্ট সামাজিক বাধা নিষেধের উর্ধ্বে যেয়ে নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। কিন্তু আমাদের মা খালাদের সময়ে এসব বিধি নিষেধের মধ্যেই তাঁদের বাস করতে হ'ত। আমার মায়ের বিয়ের ক্ষেত্রে এরকম একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। বিয়ের উপযুক্ত পাত্রের অভাব এবং এ নিয়ে নানা ও অন্যান্য আঘাত স্বজনের কম বেশী

উদ্বেগের ঘটনাপ্রবাহ মায়ের স্মৃতিতে কঠিন ভাবে ঠাই পেয়েছে। ছোট ভাই বোনদের লেখাপড়ার সুযোগ অব্যাহত রাখতে আমার মা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বাদ পড়ে যান। এ সিদ্ধান্ত ছিল এককভাবেই আমার নানার। আবার দ্বিতীয় পক্ষের নানুর বয়স পরিপন্থ না হওয়ায় নানুর উপরেও সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পুরোপুরি অর্পণ না করায় বড় মেয়ের উপর অর্থাৎ আমার মায়ের উপর সাংসারিক দায়িত্বাবলীও আপনা আপনি চলে আসে এবং সর্বোপরি মাতৃহীন আমার মায়ের বিয়েতে যে বিলম্ব হচ্ছিল, তা নানার মানসিক অবস্থার উপর কমবেশী চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। স্মৃতিচারণে মায়ের মুখে শুনেছি ঐ সময়ে ছোট ভাইবোনদের পড়াশুনার ব্যস্ততা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিল। ভাইবোনদের লেখাপড়ার ব্যস্ততার সাথে সাথে মাকেও ব্যস্ত থাকতে হতো বিভিন্ন কাজে। নিজের বিয়ের বিষয়ে মায়ের তেমন উৎকর্ষ না থাকলেও তাঁর বিয়ে নামক কার্যটি দেরীতে হচ্ছে এমন মানসিক ভার কিছুটা হলেও মায়ের ভাবনায় পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। চৈত্রের দীর্ঘায়িত দিবসের সমাপ্তি হত রাতের অন্ধকারে। বিরামহীনভাবে সময় বয়ে যেত অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। সেই অনাগত ভবিষ্যতের কোন এক সময়ে শামসুন্নাহার বেগম পারালের বিয়ের সানাই বেজে উঠবে সে বিষয়ে সকলেই ছিল নিশ্চিন্ত।

ভোলায় নানার তখন নানান ব্যস্ততা। সে সময় ভোলায় নবনির্মিত প্রাইমারী ট্রেনিং ইস্টেটিউট (পি,টি,আই) এর নির্মাণ কাজ চলছিল। বাইসারীতে জি.টি স্কুলে চাকুরীকালীন অবস্থায় নানা বুখাইনগরের জয়নাল মুসীকে পিয়নের চাকুরী দিয়েছিলেন। সেই থেকে জয়নাল যেন এ পরিবারেরই একজন সদস্য ও বিশ্বস্ত বন্ধু। নানার ভোলায় চাকুরীকালীন সময়ে সেই জয়নালও ভোলায় কর্মরত ছিল। ঐ সময়ে পি,টি,আই এর সুপারিনেটেন্ট পদে নবনির্মাণ প্রাপ্ত এক অতি উৎসাহী সরকারী কর্মকর্তা যোগদান করেন। এই উৎসাহী কর্মকর্তার বিস্তারিত বিবরণীতে পরে আসছি। জয়নাল মুসীর সব কথা আমার মায়ের মনে নেই। তবে সেই জয়নাল মুসী ছিলেন আমার মায়ের বিয়ের ঘটক। তার পরিচিত খলীফা নামের একজন কর্মচারী পাত্রের দেখাশুনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। গৃহকর্তার রান্নাবান্নার ব্যাপক ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার জন্য কিনা সঠিক জানা যায়নি, এ খলীফা নামের ব্যক্তি তার ঘনিবের জন্য একজন ভালো ও বংশীয় পাত্রীর সন্ধান দিতে জয়নাল মুসীকে কথাচলে অনুরোধ করেছিলেন। তখন জয়নাল মুসী সরাসরি নানাকে এই পাত্রের সাথে আমার মায়ের বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেছিল। পাত্রের বিবরণও বেশ পছন্দসই। পাত্রের বাড়ী

পটুয়াখালী জেলায়। লেখাপড়ায় অদ্বিতীয়। প্রাইমারী ও জুনিয়র স্কুলে বৃত্তি পাওয়া এ পাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন এবং এম,এ (এড) ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ডিগ্রীপ্রাপ্ত। ভার্ণাকুলার টিচার হিসেবে প্রথমে পাট্টিশিবপুর প্রাইমারী ট্রেনিং সেন্টারে এবং বরিশালে পি,টি,আই এর ইলেক্ট্রাস্ট্রুমেন্ট পদে হিসেবে চাকুরী করে ১৯৫৪ সনে ভোলায় পি,টি,আই এর সুপারিনেটেণ্টের পদে হিসেবে চাকুরী করে ১৯৫৪ সনে ভোলায় পি,টি,আই এর সুপারিনেটেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত। এহেন শিক্ষিত এবং সরকারী চাকুরীরত উপযুক্ত পাত্র নিশ্চয়ই অভিষ্ঠিত। একজন অভিভাবকের কাছে গ্রহণীয় প্রস্তাৱ হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু সমস্যা দেখা গেল অন্যত্র। পাত্রের বয়স নেহায়েত কম কিছু নয়, প্রায় পঁয়ত্রিশ এর কোঠায়। তাছাড়া পাত্রের মা ও ভাইবোন সবাই গ্রামীণ কাঠামোর মধ্যে লালিত পালিত হয়েছেন। নগর জীবনের কৃত্রিমতা বা আধুনিকতার সাথে পাত্রের পরিচিতি থাকলেও পরিবারের অন্য সবাই গ্রামীণ জীবনযাত্রায় অভ্যন্ত এবং সাবলীল। স্বাভাবিকভাবেই এ পাত্র শিক্ষাদীক্ষা ও চাকুরীতে ভাল অবস্থানের একজন মানুষ হলেও তাঁর জীবনযাত্রা, আবেগ, অনুভূতি এবং আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট গ্রামীণ পরিবেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে বলেই শহুরে জীবনে অভ্যন্ত এবং বেড়ে ওঠা নানার পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে সাংঘর্ষিক হতে পারে, এরূপ দৃশ্টিতা আমার নানার চিন্তার জগতকে আন্দোলিত করেছে বলে আমার মায়ের বিশ্বাস। কেননা বৎসর্মায়া নিয়ে নানার অহংকারের বহিঃপ্রকাশ যে একেবারে ছিল না এমন নয়। বরং স্মৃতিচারণে আমার নানা তাঁর পূর্বপুরুষের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন সন্তানদের কাছে বহুবার। কখনো অভিথায় ব্যক্ত করেছিলেন পারিবারিক ইতিহাস রচনার। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। জীবনের অনেক ইচ্ছাই তো অপূর্ণ রয়ে যায়, অনেক কাজই তো অসম্ভাষ্ট রয়ে যায়। বদলে যাওয়া সময়ে সে সব অপূর্ণ ইচ্ছা বা অসম্ভাষ্ট কাজ পূর্ণ হয় বা সম্ভাষ্ট হয় অন্য কারো দ্বারা, অন্য কোনভাবে। আর সেই অভিলাষ পূরণে মায়ের অন্দকারে ডুবে থাকা স্থৃতি থেকে আমার নানার পূর্ব পুরুষের সেই ইতিহাসকে না হয় একটু আলোর পথিবীতে এনে দেই, জেনে নেই শিকড়ের শিকড়কে। নানার পূর্বপুরুষের কাহিনী ছিল এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ইতিহাসের সমসাময়িক। সুদূর ইরাকের বাগদাদ থেকে দুই ভাই এদেশে এসেছিলেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁরা বসতি স্থাপন করেছিলেন ফরিদপুরের খাবাজপুর নামক স্থানে। কালক্রমে তাঁরা এদেশে থেকে যান। বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বৎস পরম্পরায় তাঁরা ধর্ম প্রচারসহ অন্যান্য নৈতিক কার্য্যাবলীতে নিজেদেরকে ব্যাপ্ত করেন। এদেরই বৎসধরেরা পরবর্তী সময়ে বরিশালের শায়েস্তাবাদে

স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। এ সব সুফী ও আলেম ব্যক্তিদের স্থানীয় অধিবাসীরা বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখতেন। সমাজের অর্থ ও প্রতিপন্থিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এসব সুফী ও আলেম ব্যক্তিদের কিনে নিতেন বৎসীয় মর্যাদা লাভের আশায়। এ ধরনের ঘটনা ঘটত বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে। সে সময় একে বৎস বা কূল কেনা নামে অভিহিত করা হত বলেও শোনা যায়। এমন একটি ঘটনায় শায়েস্তাবাদের বাগদাদী বৎসের খোন্দকার আবুল কাশেম এর কাছে বুখাইনগরের ফকির আলী মীর নামে এক ধনাচ্য ব্যক্তি তাঁর একমাত্র মেয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন। শোনা যায় এই ফকির আলী মীর তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে সিন্দুক ভরা সোনা আর ঝর্পা উপচোকন দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এ উপচোকন দিয়েই কূল কেনা হয়েছিল। সেই খোন্দকার আবুল কাশেম আর কেউ নন, তিনি ছিলেন আমার মায়ের দাদা। কিছু ইতিহাস বৎস পরম্পরায় বেঁচে থাকে অনাদিকাল পর্যন্ত। কিছু স্মৃতি নতুন টাকার মত সব সময়ই চক চক করে, ভোলা যায় না কিছুতেই। নানার কাছে শোনা এসব কথা আমার মায়ের স্মৃতিতে আজও অমলিন হয়ে আছে।

মায়ের বিয়ের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। শেষ পর্যন্ত আমার মায়ের সকল সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় রেখে আমার নানা বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করলেন সেই অতি উৎসাহী কর্মকর্তার সাথে যিনি ভোলার নবনির্মিত পি,টি,আই এর সুপারিন্টেডেন্ট পদে চাকুরী নিয়ে ভোলার উকিল পাড়ার ভাড়া বাসায় সবেমাত্র থাকা শুরু করেছিলেন। পাঁচ বৎসরের যময দুই বোন কলক চাঁপার পরিবার সেই কর্মকর্তার অবিচ্ছেদ্য প্রতিবেশী। ১লা বৈশাখ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ (১৪ই এপ্রিল ১৯৫৪ইং) আমার মায়ের বিয়ে হয় সেই উৎসাহী কর্মকর্তা অর্থাৎ আমার আবো মুহম্মদ মুসলিম আলী আখন্দ এর সাথে। বিয়ের অনুষ্ঠানে বরপক্ষ থেকে শুধুমাত্র তাঁর ছোট ভাই মুহম্মদ ইউনুস আলী আখন্দ এসেছিলেন। তবে আমার মায়ের নানা বাড়ী থেকে উপচোকনসহ মায়ের নানা আর দুই মামা শামসুল আলম চৌধুরী ও আলতাফ হোসেন চৌধুরী এসেছিলেন। মায়ের নানাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে মায়ের দুই মামাকে অনেকবার দেখেছি যখন বরিশাল মহিলা কলেজের ছাত্রী ছিলাম। কলেজ থেকে খুব বেশী দূরে নয় এ বাসাটি। বাসাটি ছিল সদর রোডের বিবি পুকুরের পাড়ে। বর্তমানে এ স্থানটি মায়ের নানার নামে অর্থাৎ মকবুল হোসেন মার্কেট নামে পরিচিত। মায়ের সেই দুই মামাও আজ আর বেঁচে নেই। দুই মামী আর মামাতো ভাই বোনদের সাথে আমাদের এখনো দুর্বল যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

আমার মায়ের মরুময় জীবনের সেদিন শুরু হয়েছিল যেদিন নানাবাড়ীর পুকুর ঘাটে কেউ কানে কানে বলে গেল তোমার মা আর বেঁচে নেই। মা আর কোনদিন ফিরবেন না। সারা জীবন মায়ের অনুপস্থিতির বেদনায় বেঁচে থাকতে হবে এ চিরস্তন সত্যটা সময়ের সাথে সাথে জীবনের নৈমিত্তিকতায় মিশে গেল আর সময়কে ঠেলে দিয়ে জীবনের পদচারণায় নতুন গতির সঞ্চার হল। নতুন জীবনের পদধ্বনি হল আরো নিকটবর্তী। সেই নতুন জীবনের জন্য তৈরী হতে পাশে কেউ থাকল না। বরপক্ষের তরফ থেকে বিয়ের সাজ সজ্জার উপকরণ দিয়ে আমার মা নিজেকে সাজালেন একা একা। ছোট বেন মঞ্জু ততটা বুবাদার হয়ে ওঠেনি তখনও। নানু অন্তঃসত্ত্ব ছিলেন। সাথে ছিল কিছু শারীরিক অসুস্থিতা। আবু ও কবীর দুই ভাই বোনের বিয়ে উপলক্ষে ব্যস্ত ছিল সর্বক্ষণ। পরিবারের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে যিনি সবাইকে মেহের সুশীতল ছায়ায় নির্ভাবনায় রেখেছিলেন সেই পারকল সবাইকে ছেড়ে নিজের সংসারে চলে যাবে। এ যাবার কষ্ট গভীর ক্ষতের মতই মায়ের মনে যন্ত্রণা তৈরী করছিল। নানা তাঁর সাধ্যমত এ বিয়ে উৎসবমুখর করতে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

### দুই.

বৈশাখের প্রথম দিনের শেষ বেলায় উকিল পাড়ার ভাড়া বাসার মুহম্মদ মুসলিম আলী আখন্দের প্রতিবেশী আমার মাকে বরণ করে নিলেন। এসব প্রতিবেশীদের সকলের কথা আমার মায়ের তেমনভাবে মনে নেই। তবে আজও আমার মা তাঁদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। কারণ সেদিনের রাতে বিশেষ রান্নার দায়িত্বটি কনক চাঁপার মা-ই সম্ভবত পালন করে থাকতে পারেন। এছাড়া আমার আবার সহকর্মী সিরাজুল ইসলাম, পি, টি আই এর ইস্ট্রাইটের ও তাঁর স্ত্রী সেদিন উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকতা পালনসহ নববধূকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। আবার এই সহকর্মীকে আমরাও দেখেছিলাম। পটুয়াখালীতে থাকাকালীন সময়ে তাঁর ছেলে মেয়েরা নাচে গানে বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। মুক্তি নামে চাচার মেয়েটি একসময় আমাদের অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিল। তার বড়ভাই নাসিম ভাই একটু তোত্ত্বা থাকায় তাকে নিয়ে ছেট বেলায় অনেক হাসাহাসি করতাম। এ জন্য মায়ের বকুলী কম খেতে হয়েনি। আজ সেই সিরাজ চাচা আর বেঁচে নেই। নাসিম ভাই আর মুক্তিরা কোথায় আছে জানি না, এখনো তাদের স্মৃতি আমাদের চোখে জীবন্ত। আগের কথায় ফিরে আসি। বাপের বাড়ী থেকে আমার মায়ের সঙ্গী হয়ে তিন ভাই বোনই তাদের নতুন দুলাভাইয়ের বাসায়

এসেছিলেন। ছোট বাসায় সবার থাকার সংকুলান না হওয়ায় প্রথম রাতে নববধূকে কষ্ট করেই থাকতে হয়েছিল। ফুলে ফুলে কোন বাসরঘর সাজানো হয়নি। কোন বিশেষ আয়োজনও ছিল না নববধূর আগমনে। নিতান্তই অনাড়ম্বর একটি সন্ধ্যা। গল্লের বই পড়ুয়া আমার স্পন্দিলাসী মা এমন অনাড়ম্বর জীবনের শুরু নিঃশব্দে মেনে নিয়েছিলেন। কল্পনার জগতে তাঁর পৃথিবী ছিল হয়তো অন্য রকম কোন পৃথিবী। কিন্তু বাস্তবের চিত্র কত না বৈপরীত্যে ভরপুর। উকিল পাড়ার সেই ভাড়াটিয়া বাসাটি মায়ের কল্পনার জগতের সব কিছুতে ধস নামিয়ে মায়ের বাস্তব জীবনের সংগ্রামের সূচনার পথ দেখিয়েছিল। পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠার পরেই আমার মায়ের হাতে আবার এক টুকরো কাগজ তুলে দেয়ার মধ্য দিয়ে এ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। এ তো কাগজ নয়, এ ছিল আগামী দিনের বউভাতের জন্য বাজারের লিষ্ট। যে লিষ্টের শুরুতেই নুন, তেল, চাল ইত্যাদি। এ ছিল আমার মায়ের আবার সাথে বিবাহিত জীবনের একান্ন বৎসরের সূচনাদিনের কাহিনী।

পারগলের সংসার শুরু হ'ল ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৬১ সনে ভোলার উকিল পাড়ার দুই কুম্হের বাসায়। প্রতিবেশী কনক চাঁপাদের পরিবার সব সময়ই শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থেকে গেল পাশে। কনক চাঁপা এ দুই যময বোন নাচে, গানে আর আনন্দে ভরিয়ে রাখত সেসব দিনগুলো। আমরা বড় হবার পরেও কনক চাঁপার নাচের ভঙিতে তোলা একটি ছবি আমার আবার এ্যালবামে স্যাত্তে রাখা দেখেছি। আবার অনেক পরে কোন এক সময় কনক চাঁপাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন বলে মনে পড়ে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়েছে কিনা জানা নেই। উকিল পাড়া থেকে আমার নানার বাসার দূরত্ব খুব একটা বেশী ছিল না। কিন্তু যোজন যোজন দূরত্ব তৈরী হয়েছিল সম্পর্কের। সম্পর্কের এ দূরত্ব পরিমাপযোগ্য না, শুধু অনুভবের পরিমত্তলে এ দূরত্বের দূরত্ব উপলব্ধি করা যায়। আমার পাঁচ ছয় বৎসরের ছোট মামার অনুভবে তা এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার মাথায় উপর থেকে একটি শ্যামল ছায়া ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আলোতে উদ্ভুসিত চেনা পৃথিবীটা কেমন বদলে যাচ্ছে, আশে পাশের মানুষ, গাছপালা, পাখি পরিচিত সবকিছু যেন দয়ামায়াহীন পাথর আর কর্কশ হয়ে আমার ছোট মামার ছোট মনটিকে অশান্ত ও এলোমেলো করে দিচ্ছিল। চিরচেনা শোলক বলা কাজলা দিদি যেন হারিয়ে যাচ্ছে, কোন কিছুর বিনিময়ে কাজলা দিদিকে আগের মত করে পাওয়া যাচ্ছে না। ছোট মামা অভিমানী হলেন, আরো জেদি হলেন, নানার বাড়ীর শূন্যতা

কাটাতে উকিল পাড়ার কাজলা দিদির বাসায় ঘুমাতে যাওয়া, মাঝারাতে একা একা জেগে উঠে কেঁদে চিংকার করে সব কিছু প্রতিবাদ করা, কাজলা দিদিকে কাছে পাবার এসব কৌশলই ধীরে ধীরে অকার্যকর হয়ে গেল। বদলে গেল সময়, বদলে গেল পরিবেশ পরিস্থিতি, বদলে গেল জীবন, সয়ে গেল জীবনে বদলে যাওয়া সবকিছু। সময়কে কিছু দিয়েই ধরে রাখা গেল না। এদিকে আমার মায়ের পরিবর্তিত জীবনে যোগ হ'ল নতুন নতুন নতুনত্ব। যার অধিকাংশই এসেছিল আনন্দ আর কষ্টের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে। নতুন পরিবেশ, নতুন সবকিছু, রাতারাতি নিজের করে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হ'ল। এই প্রক্রিয়ায় আমার আবাবা এবং তাঁর পছন্দ, অপছন্দ, মনমানসিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে বুঝতে পারা যেন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ছোট মামার আকৃতি মিনতি কিংবা নতুন সংসারে তার যখন তখন অনুপ্রবেশ আমার আবাবার ভাললাগা বা না লাগার গভীকে যাতে অতিক্রম না করে সেদিকে প্রথম দৃষ্টি রেখে এবং একই সাথে অন্তরের অসংহিতে ছোট ভাইয়ের জন্য দীর্ঘ দিনের পুরে রাখা স্নেহ মমতার পাত্রখানি প্রয়োজনে গোপন রেখে অংসর হওয়া ইত্যাদি অভিনয়ে মা খুব ভালো দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন-এমন ভাবা সঠিক হবে না। সেই পঞ্চাশ দশকে পিতৃতাত্ত্বিক সমাজে স্বামীগৃহের সব কিছুকে আপন করে নেবার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে কত যে কসরৎ কিংবা অভিনয়ের আশ্রয় নিতে হত যা থেকে এযুগের মেয়েরা কিছুটা হলেও মুক্ত। তাই বিবাহিত জীবনের শুরুতে এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল যেসব মা স্বীকার করে নিয়েছেন। আবাবার পারিপাট্য এবং কাব্যিকতাকে নিজের জীবনধারায় পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিফলিত করার ব্যর্থতাও কিছুটা ছিল। বাপের বাঢ়ীতে আমার মায়ের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু ভাব ছিল না, ভারটি বইতো অন্য কেউ। নিজ গৃহে দায়িত্ব এবং তার উভয়ই অলিখিতভাবে বহনে আমার মাকে হিমসিম অবস্থায় থাকতে হত। আবাবা ও মায়ের চাওয়া পাওয়ায় মধ্যে কিছু পার্থক্যের কথা মা অপকর্তে স্বীকার করেছিলেন। এ সব বৈপরীত্যের মধ্যেও একটি নতুন কিছু পরিবর্তন আবিষ্কার করেছিলেন আমার মা, আমার মায়ের আনন্দ অধ্যায়ের স্মৃতি হয়ে সেসব দিনগুলো অক্ষয় হয়ে আছে। মায়ের কাছে শুনেছিলাম সেসব নতুন নতুন পরিবর্তনের কিছু ঘটনা। ইঠাং করে মা খেয়াল করলেন বাসায় স্কুল কলেজে পড়ার বইখাতার স্তুপ, পড়ার টেবিল, নিরিবিলি পড়ার পরিবেশ তৈরীতে আমার আবাবার উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নেই। মাকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যই এতসব আয়োজন আমার আবাবার। আমার মায়ের জন্য এ ছিল অকল্পনীয় প্রাণি। নীরব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আবাবা সন্ধান পেয়েছিলেন আমার মায়ের

অত্থ ইচ্ছা অনিচ্ছার ক্ষেত্রভূমি। পড়াশুনা আর জ্ঞান অর্জনে মাকে সুযোগ দেবার এমন আগ্রহ ও পরিশ্রম আমার আবাবা করেছিলেন শুধু মায়ের জন্য। এ ক্ষেত্রে আবাবার উদারতার অপূর্ব গুণাবলীর আবিঙ্কার আমার মায়ের জন্য ছিল গর্বের বিষয়। আবাবার আরো একটি গুণের কথা না বললেই নয়। তিনি যে কোন কাজ নিখুঁতভাবে করতে রীতিমত ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর এই নিখুঁতভাবে কাজ করার মাত্রা এমন পর্যায়ে ছিল যে কারো পক্ষে যে কোন কাজে এমন নিপুনতা বজায় রাখা ছিল অসম্ভব। কোন কাজ একেবারে ত্রুটি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সীমাহীন পরিশ্রম করে যেতেন। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। যে কোন অসুন্দর পরিবেশ তাঁকে রাগার্বিত করত। এমন একটি ঘটনা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। আমরা তখন মায়ের সব কিছুর সঙ্গী হয়ে উঠেছি মাত্র। মায়ের সাথে আমাদের সম্পর্কটা বন্ধুর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। মায়ের সুখ দুঃখের সব কিছুই শেয়ার করতাম আমরা চার বোন। আবাবা সব সময় সাজানো গুচ্ছনো ঘরোয়া পরিবেশ পছন্দ করতেন, জায়গার জিনিস ঠিক জায়গা মত না পেলে বিরক্ত হতেন। এসব বিষয়গুলো আমাদের খুব ভালভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময়ই অনিচ্ছাকৃতভাবে আবাবার পছন্দের কাজগুলো করতে ভুল হয়ে যেত। অফিস থেকে বাসায় ফেরার পরে আবাবাকে একটি সারপ্রাইজ দেব বলে মা আর আমরা বোনেরা মিলে সমস্ত ঘরদোর পরিক্ষার করলাম, কোথাও মাকড়সার জাল থাকল না, প্রতিটি জিনিস আবাবা যেভাবে রাখেন ঠিক সেভাবে রাখা হ'ল, এমন কি ফুলদানীতে কিছু ফুল রাখার ব্যবস্থাও করা হ'ল। আবাবা অফিস থেকে ফিরছেন আর আমরা অপেক্ষা করছি বাহবা পাবার, যদিও মা সন্দিহান ছিলেন হয়তো কোথায়ও কোন ত্রুটি রয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের চোখে তা ধরা পড়ল না অর্থাৎ ভুল ধরার কোন পথই আমরা রাখলাম না। আবাবা বাসায় ঢুকেই দেয়ালে রাখা তাঁর মায়ের ছবির ফ্রেমটা বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে কেন -এই অসঙ্গতিটি দেখিয়ে দিতেই আমরা অধিক শোকে হেসে ফেলি। সত্যিই আমরা কেউ অসঙ্গতিটি খেয়াল করিনি।

ভোলার জীবনে মায়ের নতুন সংসারের কথায় ফিরে আসি। আমার মা তাঁর প্রথম সন্তানের মা হলেন। আমার বড় ভাই মুস্তাফা মাহ্মুদ (খসরু) এর জন্য হোল ১৮ই মার্চ, ১৯৫৫ সালে ভোলার উকিল পাড়ার ভাড়া বাসায়। এ সময় আমার এক ফুফু নাম নূরজাহান তিনি ছিলেন মায়ের সঙ্গী। এই ফুফুকে মা খুব ভালবাসতেন। তার সাথে মায়ের এমন আন্তরিক সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল যে, তিনি অনেক সময় আমার মায়ের পক্ষ হয়ে আবাবাকে তাঁর ভুল ধরিয়ে দিতেন।

মায়ের কাছে এ ফুফুর বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক ঘটনা শুনেছি। কিন্তু খুব অসময়েই পৃথিবী ছেড়ে যান তিনি। রেখে যান তিন ছেলে এবং আমাদের ফুফাকে। ফুফার সমবয়সী সকলেই মোটামুটিভাবে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। অত্যন্ত বৃক্ষ অবস্থায় আমাদের এই একমাত্র ফুফা এখনো বেঁচে আছেন। তৎকালীন সময়ে দক্ষিণ অঞ্চলে দ্বিতীয় বিয়ে করা একটি স্বাভাবিক রীতি হওয়া সত্ত্বেও আমার এই ফুফা জীবনে আর বিয়ে করেননি।

আমার মায়ের বড় ছেলে আর আমাদের সবচেয়ে বড় ভাই যাকে আমরা ডাকি ভাইয়া, বর্তমানে কানাড়া নিবাসী দুই ছেলে আর এক মেয়ের জনক। এই ভাইয়ের দেশ থেকে বাঁধন ছেঁড়ার সময়কাল ১৯৭৫ সনে। আমাদের ভাইয়ার এখন শিকড় ছেঁড়া এক প্রবাসী বাংলাদেশী। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে ভাইয়ার সাথে আমাদের দুন্তর দূরত্ব বেড়েছে। মা তাঁর বড় ছেলের লক্ষ্মা স্মৃতির পাতা উল্টাতে গেলেই কেমন আনন্দনা হয়ে পড়েন। মনে পড়ে যায় নিজের আপন দুটি ভাইয়ের কথা। মা তিল তিল করে যে ভাইদের মাত্স্নেহে বড় করে তুলেছিলেন, তারাও একসময় বড় হ্বার জন্য রাজধানী ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। তারপর আর কখনোই ফেরেননি নিজ ঠিকানায়। শিকড় থেকে দুভাই নিজেদের অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। এভাবেই ভাই বোনের সম্পর্ক আপনা আপনি শীতল হয়ে পড়েছিল। তেমনি মায়ের বড় সন্তানটিও দেশের সীমানা পেরিয়ে দূরে, বহু দূরে চলে যাবার বাস্তবতা মাকে মেনে নিতে হয়েছিল সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রয়োজনে। আজ জীবনের অপরাহ্নে বড় ছেলের নেইকট্য বা সান্নিধ্য পাওয়ার বিষয়টি শুধুই স্বপ্ন। তবে ডিজিট্যাল বিশ্বে ইন্টারনেটে মা ও ছেলের সাক্ষাৎ ঘটে থ্রায়ই। কিন্তু এ সাক্ষাতের আনন্দ সেই স্বাধীনতা উত্তরকালে ভোর রাতে পটুয়াখালীর ছোট শহরে একুশে ফেরুয়ারীর ভোর রাতের মিছিলে “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেরুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি” বড় ছেলের গলায় এ গান শোনার আনন্দের থেকে বেশী নয়। কিংবা ছোট ভাই বোনদের গান প্রাকটিস করাতে বসে বড় ছেলের সেই ওস্তাদি ভঙ্গ এখন শুধু স্মৃতি হয়ে চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। এসব স্মৃতি আমার মাকে কতটা বিষণ্ণ করে তোলে তা বর্ণনার প্রয়োজন বোধ করি না।

বিয়েতে বরপক্ষ থেকে আগত ছোট চাচা মুহম্মদ ইউনুস আলী আখন্দ যিনি পাবনার কোন হাইস্কুলের শিক্ষক হিসেবে চাকুরী করতেন তিনি ছাড়া বদরপুর থামের কেউ মাকে দেখেনি। তাই আরো মাকে নিয়ে থামের বাড়ী যাবার

পরিকল্পনা করলেন। বদরপুর গ্রামের আখন্দ পরিবারের মরহুম মুহম্মদ আবদুল আলী আখন্দের মেজহেলে অর্থাৎ আমার আববা মুহম্মদ মুসলিম আলী আখন্দের নববিবাহিতা স্ত্রীকে দর্শনের অপেক্ষায় গ্রামের তামাম আঞ্চলিক স্বজন অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন। বিশেষ করে শিক্ষা বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তার শহরে যেয়েকে এ গ্রামের বউ হিসেবে পেয়ে তাঁকে দেখার আগ্রহ ছিল দ্বিগুণ। এ উপলক্ষে গ্রামীণ আঞ্চলিক স্বজনের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা আর কৌতৃহলের ক্ষমতি ছিল না। আমরা বড় হয়ে যখন কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রামের বাড়ীতে গেছি তখনও দেখেছি এ গ্রামের মানুষজনের নতুনের প্রতি অতিমাত্রায় কৌতৃহল এবং আন্তরিকতার আতিশয় অনেক সময় আগত মেহমানদের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করত। গ্রামবাসীর জন্য এ ধরনের উপলক্ষ ছিল অনেকটা বিনোদনের ব্যাপার। প্রথমবার শুশুরবাড়ীতে আমার মায়ের পদার্পণে বন্যার মত গ্রামের মানুষের যে ঢল নেমেছিল তা আজও আমার মায়ের স্মৃতিতে পরিষ্কারভাবে বিরাজমান। বর্তমান যুগের শত ব্যক্ততায় এ ধরনের কাজে সময় ক্ষেপণের মত নিষ্কর্মা সময় কারো নেই। এমন আন্তরিকতার নজির আজ কল্পনার বিষয় মাত্র। গ্রামীণ আঞ্চলিক স্বজনের এমন অভ্যর্থনা ও তাদের সহজ সরল আতিথেয়তায় শুশুরবাড়ীতে মায়ের সংক্ষিপ্ত অবস্থান চমৎকারভাবেই শেষ হয়েছিল। গ্রামীণ মানুষের রুটিনহীন জীবনযাত্রার লাগামহীন অবসর সময়গুলোতে আমার মায়ের সান্নিধ্য তাদের আনন্দ দিয়েছে। তবে শুশুরবালয় পর্যন্ত পৌছাতে কখনো নৌকা, কখনো পায়ে হাঁটা কিংবা নড়বড়ে সাঁকো পার হবার কষ্ট ছিল নববধূর জন্য মনে রাখার মত নির্দয় ঘটনা। শুশুরবাড়ীর চাল চলন, কথাবার্তা ইত্যাদিতেই যথেষ্ট নতুনত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন মা। বিশেষ করে রান্নাবান্নার ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য মাকে শাশুড়ী আর নন্দ জা'দের কাছ থেকে বিশেষ কিছু রান্নার তালিম নেয়ার উৎসাহী করে তুলেছিল। আমার আববার খাবারে ঘোল আনা তৃপ্তি নিশ্চিত করার বিষয়ে মা ছিলেন সব সময়ই তৎপর। যদিও বাস্তবে দানীর মত রান্না করার সুনাম অর্জন করতে পারেননি আমার মা। স্তীর হাতের রান্না কখনোই মায়ের হাতের রান্নার মত মজাদার, স্বাদযুক্ত হয় না এতো চিরাচরিত সত্য। এমনকি বিশেষ শ্রেষ্ঠ বাবুচির পক্ষেও বোধ করি ছেলের মুখে মায়ের হাতের রান্নার মত মজাদার রান্না করা অসম্ভব। এর প্রমাণ হাতের কাছে পাই যখন আমার ভাইরাও আমার মায়ের হাতের রান্নার গুণগান গেয়ে ভাবীদের কটাক্ষের শিকার হয়ে পড়েন। তবে এসব ভাবাবেগ সময়ের সাথে সাথে বদলে গিয়ে মানুষকে বাস্তববাদী এবং আধুনিক মানুষে রূপান্তরিত করছে।

আমার দাদী বেগম আয়েশা খাতুন সম্পর্কে আমার মায়ের মূল্যায়ন অতি চমৎকার। মা তাঁকে পেয়েছেন একজন স্বল্পভাষ্যী শ্বাশুড়ী হিসেবে। অতিথিপরায়ণ এবং দয়াবতী এমন শ্বাশুড়ী পাওয়া ভাগ্যের বিষয় বলে মা তাঁকে আজও কৃতজ্ঞাতার সাথে স্মরণ করেন। দানশীলতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। অতি শৈশবে আমার দাদী বেগম আয়েশা খাতুন পিতৃমাত্হীন হন। পৈত্রিকসূত্রে তিনি মৃধা বাড়ীতে অনেক জমিজমার মালিক হয়েছিলেন। এসব সম্পত্তির তদারকি তাঁকে একাই করতে হত। আমার দাদা মুহম্মদ আবদুল আলী আখদের সাথে বিয়ের পরও তিনি মৃধা বাড়ীতে থেকে গেলেন। আখন্দ বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে দাদীর আপত্তি ছিল। মৃধা বাড়ীতেই দাদীর সন্তানরা বড় হতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে আমার চাচারা আখন্দ বাড়ীতে বসতি স্থাপন করে স্থায়ীভাবে চলে গেলেও আমার আববা মুহম্মদ মুসলিম আলী আখন্দ তাঁর মায়ের সাথে মৃধা বাড়ীতে থেকে যান। আমার দাদী আয়ত্ত্য নিজ বসতভিটায় অর্থাৎ মৃধা বাড়ীতে বাস করেন। মৃত্যুর পূর্বেই দাদী তাঁর চার ছেলে আর তিনি মেয়ের মধ্যে আমার আববাকে তাঁর অস্তিম ইচ্ছাটি ব্যক্ত করে বলেছিলেন মৃত্যুর পরেও যেন তাঁর প্রিয় বসতবাটিতে আলো জ্বলে। আমার আববা দাদীর অস্তিম ইচ্ছা পূরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন বলেই তিনি তা রক্ষার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এখন সে বসতবাটিতে শুধু মাটির প্রদীপখানিই জ্বলে না বরং সে বসতবাটি টিউব লাইটের কোমল নীলাভ আলোতে প্লাবিত। সেখানে গড়ে উঠেছে দুঃস্থ মানুষের অর্হনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যার নাম SOUL, SOUL এর ঠিকানা আয়েশা মঞ্জিল, বদরপুর, পটুয়াখালী। এ গ্রামে এখন জ্বানের আলো জ্বালাতে ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছে দাদীর বংশধররা।

বিবাহত্ত্বের ভোলার জীবনের কথকতায় ফিরে আসি। ভোলার জীবন যখন ভাল লাগতে শুরু করল, ঠিক তখনই আববা বদলীর আদেশপ্রাণ হলেন। এবারের কর্মসূল বঙড়া। দক্ষিণ ছেড়ে একেবারে উত্তরে যাত্রা। উকিল পাড়ার অনেক স্মৃতি বিজড়িত মায়ার ঘেরা বাসাটি ছেড়ে যেতে হবে বহুদূরে। স্মৃতি হয়ে থাকল ভোলা। সময় বিকশিত হয় জীবনের প্রয়োজনে। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বিকশিত সময় এগিয়ে চলে জীবনের ধূসর প্রান্তরে। এ চলা আবিরাম। কোথাও থেমে থাকার অবকাশ নেই। আমার মা-ও পারেননি থামতে। পিছনে ফিরে তাকাতে। ভোলা থেকে চলে যাবার ক্ষেত্রে মায়ের

সবচেয়ে কঠিন ও দুর্বল স্থান ছিল বাপের সংসার থেকে সত্যিকার অর্থে দূরে চলে যাওয়া। এ যাবার বেলায় ছোট ভাই কবীরের জন্য মায়ের দুশ্চিন্তা ছিল সবচেয়ে বেশী। ছোট ভাইকে ছেড়ে বহুদূরে চলে যাওয়ার অনুভূতি ছিল বেদনাদায়ক। এ যাত্রার অনুভূতির কথা আর্বা তাঁর ডাইরীতে লিখেছেন এভাবে “সবাইকে ছেড়ে খসরুর মার এই প্রথম দূরের যাত্রা। সে’ত কেঁদেই অস্ত্র। তথাপি স্বামী পুত্র নিয়ে তাকে নীড় বাঁধতে হবে। পেছনে ফেলে আসা আপনজনের মায়া মানুষকে বিচলিত করে স্বাভাবিকভাবেই।”

আর্বা সপ্রিবারে ১৯৫৫ সনের ১৬ই আগস্ট বঙ্গড়া পৌছান। শেরপুর রোডে ভাড়া বাসায় জীবনের আরো দেড় বৎসরের সময়কাল গণনায় অন্তর্ভুক্ত হ’ল। এ সময়কালের স্মৃতিগুলো নিতান্তই বিবর্ণ। বরিশাল থেকে বঙ্গড়ার দূরত্ব বেশী হওয়ায় আপনজনের সাথে যোগাযোগের তেমন কোন সুযোগই ছিলনা। নিজ দেশে পরবাসীর মতই নিঃসঙ্গভাবে কাটতে থাকে বঙ্গড়ার জীবন। মেজ ছেলে মুস্তাফা মাহবুব (নসরু) ২৩শে জুন, ১৯৫৬ সনে বঙ্গড়ায় জন্মগ্রহণ করে। নবজাতক ছেলের লালনপালনসহ সাংসারিক দায়িত্ব সম্পূর্ণ একা একা পালনে মা কিছুটা হাঁপিয়ে উঠতে থাকেন। এ সব প্রতিকূলতার কারণে বঙ্গড়া থেকে বদলীর জন্য আর্বা মরিয়া হয়ে উঠতে থাকেন। বঙ্গড়ায় বসবাসের পুরোটা সময়ই মা বিষণ্ণতায় কাটিয়েছেন।

চাকুরী জীবনে আর্বা দুইবার পটুয়াখালী পি,টি,আই এ সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে কর্মরত ছিলেন। বঙ্গড়া থেকে আর্বার প্রথমবার পটুয়াখালীতে বদলীর আদেশটি ছিল বহু আকাঙ্ক্ষিত। এস্তার চেষ্টা তদবিরের পর ১৯৫৭ সনের ৩১শে জানুয়ারী বঙ্গড়া থেকে পটুয়াখালীতে বদলীর আদেশ জারী হয়। আর্বা সপ্রিবারে ১১ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গড়া থেকে পটুয়াখালীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। অবশ্যে ১৯৫৭ সালে পটুয়াখালীর আদালত পাড়ায় পারলের পরিবারের পাঁচ বৎসরের জীবন শুরু হয়। তখনকার পটুয়াখালী থানা বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি মফস্বল শহর মাত্র। লোকবসতি কম, নগর জীবনের কোলাহলমুক্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ একটি ছোট শহর। অতিথিপরায়ণ, সহজ সরল ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অসরমান এ শহরটি বসবাসের জন্য ছিল চমৎকার। চারিদিকে নদীনালায় বেষ্টিত এ অঞ্চলের মাছের প্রাচুর্যের কথা কারো অজানা নয়। মা এখনো সেসব দিনের খাওয়া দাওয়ার বাহ্যিক এবং জিনিসপত্রের সহজলভ্যতার কথা স্মরণ করে আফসোস করেন। আদালত পাড়ার নতুন

বাসায় প্রতিবেশী হিসেবে শামসুল ইসলাম এর পরিবারটি ছিল অতুলনীয়। তিনি পটুয়াখালীর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সানু মিয়া নামেই তাঁকে সবাই বেশী চিনত। কোন এক সময় তিনি এম,পি হয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। একটি আদর্শ ও পরোপকারী পরিবার হিসেবে পাঁচ বৎসরকাল তাদের পাশে পেয়ে আমার মা মানসিকভাবে প্রশান্তিতে ছিলেন। বিশেষ করে সানু মিয়ার স্ত্রী যাকে আমার মা আপা বলে সংযোধন করতেন তিনি মায়ের স্মৃতিতে একটি বিশাল জায়গা দখল করে আছেন। তার অবদান এবং অবস্থান মায়ের স্মৃতির পরতে পরতে গ্রথিত। দুই পরিবারের সন্তানদের মধ্যেও যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তাও আমার মায়ের জন্য ছিল স্বাক্ষর। সে সময়ে আমার নানার কর্মসূল পটুয়াখালীতে হওয়ায় মায়ের জন্য তা ছিল বাড়তি পাওনা। ছোট ভাইবোন ইতিমধ্যে তরতরিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। আমার মায়ের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখও শেয়ার করার মত বড় হওয়ায় ভালমন্দ যে কোন বিষয় ভাই বোনদের কাছে বলতে পারাও জীবনে নতুন মাত্রা হিসেবে ঘোগ হ'ল। শুধু বাপের বাড়ীই নয় বরং শ্বশুরবাড়ীর সাথে ঘোগযোগ অনেক বেড়ে গেল। শ্বশুরবাড়ীর আজীয় স্বজনের পটুয়াখালীর আদালত পাড়ার বাসাটিতে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ তৈরী হ'ল। গ্রামীণ জীবনের সুখ দুঃখ, কলহ ও অভাব অন্টনের রোজনামচার সব ঘটনাই ধীরে ধীরে আদালত পাড়ার বাসায় পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। আমার মা যেন হয়ে উঠেন তাদের সুখ দুঃখের একজন সাথী। পরিবারের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে মা শ্বশুরবাড়ীর আজীয় স্বজনের কাছেও অন্তর্ভুক্ত একজন হয়ে ওঠেন। যে কোন পরামর্শ, বিপদ আপনে তাদের এ বাসাটিই পরম আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল। থায় বার মাসই বদরপুরের দু'একজন আজীয় স্বজনের অবস্থানের কারণে বাসার স্বাভাবিক পরিবেশ বিপ্লিত হ'ত একথা অস্থীকারের উপায় নেই। সন্তানদের লেখাপড়া, চিকিৎসা, বিলোদন এমনকি মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য তাদের পটুয়াখালী আসার ঘটনা ছিল নৈমিত্তিক প্রয়োজনের অংশ। এ সব মেহমানদের আতিথেয়তা ও পরামর্শ দানের জন্য আমার মা ছিলেন তাদের একমাত্র দরদী স্থল। মায়ের কাছে নিঃসংকোচে সব ধরনের সমস্যার কথা বলতে কোন বাধা ছিল না। এভাবে মা যেন তাদের একান্ত আপনজন হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরবাড়ীর লোকজনের কাছে আকার চাইতে আমার মায়ের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশী ছিল। আমার মায়ের দৈর্ঘ্য ও সহ্যের গুণবলীতে সবাই তাঁর প্রতি কৃতার্থ ও সম্মত ছিলেন। যদিও আমার দাদী কখনোই পটুয়াখালীতে তাঁর ছেলের বাসায় বেড়াতে আসেননি। শহরে বাসাবাড়ীতে তিনি বেড়াতেও পছন্দ করতেন না।

শহরে বাসা বাড়ীকে দাদী ‘পঙ্কীর বাসা’র সাথে তুলনা করতেন। মৃধা বাড়ীর নড়বড়ে ঘরটিই ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বাসস্থান।

পটুয়াখালী ছিল আবার নিজ জেলা। পটুয়াখালীর মাটির সাথে তাঁর নাড়ীর সম্পর্ক। এখানে বদলী হয়ে আবা যেন তাঁর পুরানো সব কিছু ফিরে পেলেন। আর এমনই এক পরিবেশে সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা ইত্যাদি কাজে আবা আরো গভীরভাবে মনোনিবেশ করার সুযোগ পেলেন। অনেক রাত জেগে হারিকেনের আলোতে একা একা বসে পড়াশুনা, সাহিত্য চর্চা ইত্যাদি ছিল আবার নিয়ন্ত্রণের রুটিন কাজ। ১৯৩৪ সনে আবার লেখা ও প্রকাশিত প্রথম বইয়ের নাম ‘স্বাস্থ্য পাঠ’। ১৯৫৩ সনে টেক্স্ট বুক বোর্ড থেকে প্রকাশিত হয় ‘বিঞ্চানের আলো’ বইটি, যা তৎকালীন সময়ে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য বই হিসেবে টেক্স্ট বুক বোর্ড কর্তৃক মনোনীত হয়েছিল। এরপর ১৯৫৪ সনে ‘শিশু পর্যবেক্ষণ’ নামে আরো একটি বই প্রকাশিত হয়। আবার লেখালেখির ও দাণ্ডরিক কাজের ব্যস্ততার কারণেই সংসার পরিচালনার দায়িত্ব আমার মাকেই বহন করতে হত। আবা শুধুমাত্র একজন লেখকই নন। তিনি আমার দাদীর মতই একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। আমার মা তাঁর আত্মকথনে এসব তুলে ধরেছিলেন এজন্য যে, একজন সৎ ও আদর্শ শিশু কর সংসারে আর্থিক অভাব অন্টন থাকেই এবং এর সাথে যুক্ত করেই আর্জু নে পথ চলতে হয়। আবার মত আপোষহীন এক শিক্ষকের পক্ষে মধ্যবিত্ত আবেগীয় বিষয়াদি পরিহার করা সম্ভব ছিল না বলেই সকলের সুখ দুঃখ ভাগ করে নিতে গিয়ে আমাদের সংসারের অভাব অন্টন নিয়সঙ্গী হয়ে থাকত। আবা নিজের জীবন সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে এদেশের অভাবী মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন তাঁর অনেক কবিতায়। আবার লেখা এমন একটি কবিতার চরণ,

আমার ইচ্ছেগুলো উড়ে যায় ডানা মেলে-  
শোষিত, বঞ্চিত মানুষদের কাছে।  
ইচ্ছে করে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে।  
তাদের ঐ হাড় বের করা সন্তানগুলো,  
যারা অকালে ঝরে যায়, আনন্দময় পৃথিবী থেকে,  
তাদের সুস্থ, সবল করে গড়ে তুলতে।

পটুয়াখালীতে সেজভাইয়া মুস্তাফা মাসুদ (সেলিম) ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পর পর তিন ছেলে সন্তানের জন্ম সংবাদ কাউকেই আনন্দিত করেনি। বিশেষ করে আমার দাদীর দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত নাত্নী দেখার স্পন্দনের কারণে তাঁর আফসোসের দীর্ঘশ্বাস আরো দীর্ঘায়িত হয় এবং এই আফসোস নিয়েই তিনি ১৯৬০ সালে ইন্ডেকাল করেন। মেয়ে সন্তান না হওয়ায় আমার মায়ের কোন দুঃখবোধের সৃষ্টি হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি। তবে পিঠোপিঠি তিনি সন্তানের লালন পালনের ভাবে তাঁর শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থ্রতা দিন দিন বাঢ়তে থাকে। ঘরভর্তি মেহমানের খেদমত, কাঠের উন্ননে দফায় দফায় রান্না আর মশলা পেষার এন্তেজাম থেকে এ যুগের মেয়েরা স্বাধীন। কিন্তু তখনকার মেয়েদের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে নিষ্পেষিত হতে হত। এসবের কারণে নিজেদের অস্তিত্ব অনুভবের কোন সুযোগ ছিল না। আমার মায়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে চিরাচরিত এসব দায়িত্বাবলীর পাশাপাশি আবার সাহিত্যকর্ম, মুক্ত আলোচনা, রাজনৈতিক মতাদর্শ ইত্যাদিতে আমার মা অংশগ্রহণ করতেন এবং বেশ দক্ষতার সাথে যুক্তিতর্ক খন্ডনের ক্ষমতা রাখতেন। যদিও আবার সৌন্দর্যবোধ কিংবা শৈল্পিক অনুভূতির বিষয়গুলোতে মায়ের সাড়া তুলনামূলক কম ছিল বলে দেখেছি, মা ছিলেন বৈষয়িক ও বাস্তববাদী। আবার ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা আর কাব্যিক। মায়ের স্পষ্টবাদিতা আবার কাছে কট্টর মনে হলেও সংসারে এমন স্পষ্টবাদিতার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি অঙ্গীকার করতে পারেননি।

পটুয়াখালীতে বসবাসের বৎসরগুলো সুখ দুঃখে গড়িয়ে যেতে থাকে। এরই মধ্যে তিন ছেলের পর ৭ই জানুয়ারী, ১৯৬০ সনে মায়ের সর্বকনিষ্ঠ ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। আমার মায়ের নামের সাথে মিল রেখে তার নাম রাখা হয় শামসুল আজম (কুটু)। অন্য তিনি ভাইয়ের চেয়ে তার গায়ের রঙ সামান্য কালো ছিল বলেই আমাদের প্রতি আবার নির্দেশ ছিল ছোট ভাইকে সোনাভাই বলে ডাকবার। ছোট বেলা থেকেই একটু রোগাটে আর অসুস্থ থাকায় এ ভাইটি তেমন কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারত না। বিশেষ করে তার জন্মের পর থেকে মায়ের শরীর আরো অসুস্থ হয়ে পড়ায় এ ছেলেটির ভাগ্যে মায়ের যত্ন ও স্নেহ মমতার অভাব ঘটেছিল। এ অভাব নিয়ে তিনি বড় হতে থাকেন। চার ছেলেকে নিয়ে আজও এক সমুদ্দর স্মৃতির মেলায় মায়ের বসবাস। তাদের ছোটবেলার অনেক ঘটনা মায়ের মুখে শুনেছি। স্কুল থেকে ফিরে সবাই চলে যেত খেলার মাঠে। সন্ধ্যা বেলায় তাদের ঘরে ফেরার সময় হত। পড়ার

টেবিলে বসার সাথে সাথে ছেলেদের ঘুমের রাজ্যে চলে যাবার দৃশ্যগুলো এখন শুধু স্মৃতি। এর মধ্যে বড় আর মেজ ছেলের একটি ঘটনা খুবই লোমহর্ষক। বড় ছেলের বয়স তখন সম্ভবত চার আর মেজ ছেলের তিন বৎসর। পটুয়াখালীর বাসায় দুপুর বেলায় মা ঘুমিয়েছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় মা হঠাৎ জেগে উঠে দেখেন দুই ছেলের কোন সাড়াশব্দ নেই। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে এসে মায়ের চোখ ছানাবড়া। মেজ ছেলে মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে আর বড় ছেলে কোরবানীর গরুর মত মেজ ছেলেকে জবাই দেবার জন্য তার ছোট হাতে রান্নাঘরের দা খানা উপরে তুলে ধরেছেন। মেজ ছেলে চোখ বন্ধ করে তার জবাই হয়ে যাবার মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল। আবার লেখা “আমাদের ছেলেমেয়েদের (জন্মকথা)” নামের বইটিতে তিন ভাইয়ের দুঃসাহসের এরকম আরো একটি ঘটনার বর্ণনা এরকম “ফেরার পথে প্রথম রৌদ্র, ভোলার ১নং পুলের নিকট থেকে নৌকা থেকে উঠে খসড় নসরং ও সেলিম বিনা ছাতায় ৫ মাইল পথ হেঁটে মেদুয়া পৌছাল, এটা তাদের পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসিক কাজ।” আমাদের বড় তিন ভাই এ দুঃসাহসের কাজটি করেছিলেন সম্ভবত ১৯৬৩ সনে যখন আবার মেদুয়ায় কর্মরত। পিঠেপিঠি চার সন্তান নিজেরাই নিজেদের বন্ধুর মত ছিল। তাদের বাইরের কোন সঙ্গ প্রয়োজন হ'ত না। এদিক দিয়ে মা অনেকটা ভারযুক্ত থাকতেন। বেশী ভাই বোন থাকার কারণে সন্তানদের মধ্যে কিছু ভাল গুণাবলীর বিকাশ আপনা আপনি তৈরী হয়েছিল বলে মা মনে করেন। আঞ্চেন্দিক হওয়া বা স্বার্থপরতার মত বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের চরিত্রে কখনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। বর্তমান যুগের একক পরিবারে ছেলে মেয়েদের মধ্যে অনেক সৎ গুণাবলীর অভাব মা তাঁর অভিজ্ঞতায় ঘোলা চোখে এখনো অনুভব করে থাকেন।

পটুয়াখালী বসবাসের শেষের দিনগুলো ধীরে ধীরে নিষ্পত্ত হয়ে আসছিল। নানার পটুয়াখালী থেকে ভোলায় বদলী হওয়ার কারণে মায়ের মন শূন্যতায় ভরে ওঠে। দাদীর ইন্তেকালের পর শুগুরবাড়ীও থাণহাইন হয়ে পড়ল। দাদীর বসতবাড়ীটি অঙ্ককারে ডুবে থাকল। এখানকার শেষের দিনগুলো আর ফুরাতে চাইছিল না। নানার ভোলা বদলীর কারণে মা মানসিক দিক থেকেও বেশ বিপর্যস্ত অবস্থায় দিন কাটাতে থাকেন। এ সময়ে পঞ্চম বারের মত মা অন্তঃসন্ত্ব হলে তাঁর শারীরিক ও মানসিক উভয় স্বাস্থ্যের জন্যই যত্নের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। এ দুঃসময়ে আবার বদলীর আদেশ হয় মেদুয়া। ভোলার পিটি আই তখন মেদুয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। এ বদলীর আদেশে আবার

ভীষণভাবে মনঃস্ফুর্প হয়েছিলেন। তবে আবার বদলীতে নানার প্রচলন ভূমিকা থেকে থাকতে পারে। কেননা নানা তখন মায়ের মানসিক শাস্তির জন্য তাঁকে নিজের কাছে রাখার প্রয়োজন বোধ করছিলেন। মায়ের কষ্টগুলো উপলক্ষ্য করে নানা নিজেও ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে আমার মাকে একটু আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দেবার উপায় খুঁজতে রীতিমত উদ্ধৃতি ছিলেন। আবার মেদুয়া বদলীর কারণে নানার সে ইচ্ছার বাস্তবায়ন হয়েছিল। পটুয়াখালী থেকে মেদুয়া যাত্রাকালে মা ভোলায় নানার বাসায় বেশ কয়েক ঘাস থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। নানু ও সব ভাইবোনরা তাদের সব স্নেহ ভালবাসা উজাড় করে মায়ের সেই কঠিন সময়কে নিরাপদ আর আনন্দময় করে তুলেছিল বলে মায়ের কাছে জেনেছি। এ সময় মায়ের বোন নূরগন্ধাহার বেগম (মঞ্জু) এর বিয়ে হয় ১৯৬২ সনে। পাত্র উচ্চশিক্ষিত এবং প্রগতিশীল। তিনি ভোলার নামকরা ইলিমা মিয়া বাড়ীর ছেলে। ভোলা সরকারী কলেজের অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘদিন চাকুরী শেষে বর্তমানে তিনি ভোলায় নিজ বাড়ীতে অবসর জীবনযাপন করছেন। আমার খালাম্মা সারাজীবন ভোলা সরকারী গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা করে সহকারী প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে অবসর নিয়ে এখন মাঝে মধ্যে ঢাকায় ছেলের বাসায় নাতি নাত্নীর সাথে আনন্দময় সময় পার করেন। খালাম্মার দুই ছেলে আর এক মেয়ে বিনেসুতার মালার মত আমাদের জীবনের সবকিছুতে ছড়িয়ে আছে।

নানার বাসায় অবস্থানকালে ১৯৬২ সনে আমার মা দুটি যময মেয়ের ম্যাহলেন। পাঁচ কি সাত মিনিটের ব্যবধানে পর পর দুটি মেয়ের জন্মগ্রহণের খবরে আনন্দে ভোলে গেল নানাবাড়ীর সবাই। আবার আনন্দ ছিল ভাষাতীত। আবার অন্য কোন ভাইয়ের মেয়ে সন্তান ছিল না। দাদীর জীবিতাবস্থায় নাত্নী দেখার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। পর পর চার ছেলের পর একটি মেয়ে সন্তানের জন্য আবারও আকুল ছিলেন। তাই যময দুই মেয়ের জন্মগ্রহণ ছিল অপ্রত্যাশিত আনন্দের একটি খবর। কিন্তু এ যময দুই মেয়ের জন্মের পর তাদের লালন পালনের বিষয়টি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছিল। কারণ তখন আমার মা একেবারেই শয্যাশায়ী। বলতে গেলে মৃত্যুর সাথে লড়াই করার অবস্থা তখন মায়ের। এসময় আমার নানুর ভূমিকা ছিল স্মরণীয়। তিনি তাঁর সবটুকু শক্তি নিঃশেষ করেছিলেন মায়ের সদ্য নবজাতক দুই সন্তানকে জন্মকালীন সবধরনের অসুখ বিসুখ আর বিপদগ্রস্ততা থেকে মুক্ত রাখার কাজে। তিনি এমনই একজন মানুষ যাকে সব সময়ই শ্রদ্ধাবনত হয়ে আমার মা শ্মরণ করেন। শুধু আমার মায়ের প্রসবকালীন সময়ই নয় বরং আমাদের যেকোন

অসুখ বিসুখ কিংবা বিপদে তাঁকে পেয়েছি একান্তভাবে। আমাদের মা হ্বার সময়ে এই নানুর উপস্থিতির জন্য আমরা কি-ই-না করেছি। তিনি কাছে থাকলে আমরা সবাই মানসিক শক্তি পেতাম। আমরা সবাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। বর্তমানে অত্যন্ত বৃক্ষাবস্থায় বরিশালে তাঁর ছেলেদের সাথে অবস্থান করছেন। তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্যের কথা প্রতি মুহূর্তে আমার মা ঘনে করিয়ে দেন। তাঁর মত নির্মল ও সাদা মনের মানুষের দীর্ঘায়ু কাম্য সবার।

নানা নানু ও ভাইবোনদের সেবা যত্নে স্নাত হয়ে মা ধীরে ধীরে সুস্থ হতে থাকেন। মা সুস্থ হয়ে উঠতে থাকলে সবাইকে নিয়ে আব্রা মেদুয়া যাবার পরিকল্পনা করেন। ১৯৬১ সনে আব্রা সপরিবারে মেদুয়া আসেন। মেদুয়ার জীবনে আমার বড় চার ভাইয়ের ক্ষুলে যাওয়া শুরু হয়েছিল। ভাইয়েরা সবাই পড়াশুনায় খুব ভালো ছিলেন। আব্রা তাঁর ডাইরীতে ভাইদের পরীক্ষার ফলাফলসহ তাদের কবে, কত ডিগ্রী জ্বর হয়েছিল, কোন তারিখে কত ওজন হয়েছিল এবং তাদের খেলনাশুলোর ছবি পর্যন্ত এঁকে রেখেছিলেন। আমরা যদ্য দু'বোন আব্রা ও মায়ের মেহের আঁচলে বড় হতে থাকলাম ধীরে ধীরে। আমাদের প্রতি মাত্রাত্তিক্ষণ মনোযোগ এবং সব কিছুতেই বেশী প্রাধান্য দেয়ার আব্রা অনেক সময়ই মায়ের সমালোচনার সম্মুখীন হতেন। দুই মেয়েকে একসাথে লালন পালনের দায়িত্ব মায়ের পক্ষে একা সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে আমাদের জন্মের পর থেকে মায়ের হাটের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ঐ সময় ভাইয়েরাও নিজেদের দেখাশুলের জন্য তেমন বড় হয়ে উঠেনি। কাজেই তাদেরও দেখাশুলার দায়িত্বও শেষ হয়নি। এরকম এক পরিস্থিতিতে ছয় সন্তানের দেখাশুলার ব্যাপারে আব্রা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি মায়ের সব ধরনের সুযোগ সুবিধার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতেন। আমাদের দুই বোনের জন্য অতিরিক্ত পাঁচজন কাজের লোক রাখা হয়েছিল বলে মায়ের কাছে শুনেছিলাম। মেদুয়ার জীবন যখন শুধু দায়িত্বভারে ঝান্ট তখন আব্রা সপরিবারে গ্রামের বাড়ী বদরপুরে এসেছিলেন সবার জন্য একটু ভিন্ন পরিবেশে কিছুদিন অতিবাহিত করার জন্য। আব্রার ডাইরীতে বদরপুর আসার সে ঘটনার বর্ণনা ছিল এরকম—“সবাইকে নিয়ে বাড়ীতে গেলাম। ১৭/৯/৬৩ (ঘঙ্গলবার) (বাংলা ২১শে ভাদ্র, ১৩৭০সাল) সকাল ৮টায় মেদুয়া থেকে নৌকায় উঠলাম। ভোলা খেয়াঘাটে লঞ্চ ধরলাম দুপুর ২টায়। ঐ তারিখ বরিশাল হয়ে রাত ১২টায় স্টীমারে পটুয়াখালী পৌঁছে গেলাম। শেষ রাতে নৌকা যোগে বাড়ী গেলাম। ২রা অঞ্চোবর বুধবার (বাংলা ১৫ই আশ্বিন,

১৩৭০) দিনগত রাত্রে নৌকায় উঠলাম। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নলছিঠি পোঁছে রাতে তেরুলিয়া পাড়ি দিলাম। মেদুয়া পোঁছে গেলাম ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবার দুপুর ১২টায়। পরদিন Institute খুল্ল। বাড়ীতে মীনা ও রীনা এই প্রথমবার বেড়াতে গেল। জন্মের পর তারা আর বাড়ীতে যায়নি। বাড়ীতে মোটামুটি আনন্দেই কাটাল।” আবার এ লেখা থেকে সেই অর্ধ শতাব্দী আগে এদেশের যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। নদী পথে যাতায়াত সময় সাপেক্ষ হলোও সেসব দৃশ্যগুলো কল্পনার চোখে দেখতে এক অকৃত্রিম এক আনন্দ অনুভব করি। আজ সেই মেদুয়ার অস্তিত্বই নেই। মেঘনার অতলে বিলীন হয়ে গেছে মেদুয়া নামের গ্রামটি। মেদুয়া পি,টি আই কিংবা ঐ সময়কার সব ঘটনা আজ স্মৃতি হয়ে থেকে গেল। তবে মায়ের স্মৃতিতে মেদুয়ার অস্তিত্ব বেঁচে থাকবে আজীবন। কারণ মেদুয়ায় থাকাকালীন সময়েই আমার নানা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে উচ্চ রান্ধচপের চিকিৎসার জন্য নানাকে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু নানা আর সুস্থ হয়ে উঠেনি। ডাক্তারদের ভুল চিকিৎসাই নানার মৃত্যুর কারণ ছিল বলে আত্মীয় স্বজন সবার মধ্যে একটা সন্দেহ ছিল। ১৯৬৫ সনের ২৪শে জুলাই ছাপান্ন বৎসর বয়সে নানা ইন্সেক্ট করেন। আমার মা এবং সবাইকে একেবারেই এতিম করে তিনি এখন ঘুমিয়ে আছেন খোল্দকার বাড়ীর কবরস্থানে। ২০০৮ সনের ডিসেম্বর মাসে তাঁর কবর জিয়ারতের সুযোগ পেয়েছিলাম, সে অর্ঘণ বৃত্তান্তের কথা পরের অংশে আসবে।

তিনি।

মেদুয়া থেকে আবার বরিশাল বদলী হয়ে এলেন ১৯৬৫ সনে। বরিশালের দিনগুলো যেন একটু আলাদা হয়ে দেখা দিতে থাকল। সংসারে পারিপাট্য না এলেও চাকাগুলো সাবলীল গতিতে চলতে শুরু করেছিল। নানার মৃত্যুর পর কবীর মামাকে মা নিজের কাছে নিয়ে এলেন। বরিশালেই তার পড়াশুনা শুরু হ'ল। তার মেধার যথাযথ বিকাশের পথে আবারার দিক নির্দেশনাও সহায়ক হ'ল। এসময়ে বাসার পরিবেশটি সদা অস্থির আর চপ্পলভায় ছেয়ে ছিল। আমরা দুইবোনও বড় হচ্ছিলাম। তবে বড় চার ভাইদের সাথে আমাদের দুই বোনের যুদ্ধাবস্থা আমার মাকে সবসময়ই তটস্থ করে রাখত। ছোট বেলায় আমরা দুইবোন আবার অতিরিক্ত আদরে ভাইদের বিরাগভাজনের কারণ হয়েছিলাম। আমাদের কান্না আবাকে এতই বিচলিত করত যে, কান্নার কারণ

বিশ্বেষণ না করেই তিনি ভাইদের দোষারোপ করতেন। আবার বাধের মত ছঁকারে কিংবা কখনো কখনো উত্তম মধ্যম এর ভয়ে ভাইয়েরা এসব নীরবে হজম করলেও ভিতরে ভিতরে আমাদের উপর ক্ষুক থাকতেন। আবার ট্যুরে বাইরে গেলেই এসবের প্রতিদান ঘিলত। বিভিন্ন নামে যেমন ‘ননীর পুতুল’ ‘ফুলের ঘায়ে মুচ্ছী ঘায়’ ইত্যাদি বাক্য ব্যয়ে আমাদের দু’বোনের উপর চড়াও হত ভাইয়েরা। প্রতিদিন নতুন নতুন কৌশল আবিক্ষার হ’ত আমাদের হেদায়েত করার জন্য। আমরা অপেক্ষায় থাকতাম আবার পথ চেয়ে। এসব ঘটনার স্মৃতিচারণে মা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি তিনি ছেলেদের পক্ষ অবলম্বনে কতটা তৎপর ছিলেন।

“আমাদের ছেলেমেয়ে (জন্মকথা)” নামে বইটিতে সংযুক্ত হল আরো একটি জন্মের শুভবার্তা। “আজই ৯ই চৈত্র, ১৩৭২ বঙাদ-২৩শে মার্চ, ১৯৬৬ ইংরেজী সন এবং ৩০শে (জিলকদ ১৩৮৫ হিজরী সন) আজ সকাল ১১টা ১২ মিনিটের সময় মীনা ও রীনার ছোট বোনের জন্ম হয়। নার্স মিসেস শান্তি দাস। জন্মস্থান গৰ্ভন্যেন্ট ফ্লাট নম্বর ই/১-৪ বরিশাল। ২৩শে মার্চ থেকে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত পাঁচ দিনের ছুটি নিতে হ’ল। নববৃগ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা থেকে আজকের দিনপঞ্জী লেখা হ’ল(পৃ-৫০১)।” আমাদের দুজনার জন্মাহণের চার বৎসর পর আবারও একটি কল্যাণ সন্তানের জননী হলেন মা। তার নাম রাখা হল রূবী। ছোট বেলায় তাকে সবাই অধুমালা বলে ডাকত। আমরা মা তাকে ডাকত সোনার মেয়ে বলে। এতদিন আমরা দু’বোন ছিলাম সব কিছুর রাজা। রূবী হ্বার পর আমাদের প্রতি মনোযোগের কিছুটা কমতি হওয়ায় আমরা বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেছিলাম বলে মায়ের কাছে গল্প শুনেছি। রূবীর প্রতি আমাদের অনুভূতি ছিল “ও যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে” এ জাতীয়। তার উপরে রূবী খুব সুন্দর হওয়ায় সবাই তাকে নিয়ে বেশী মেতে থাকত বলে আমরা মানসিকভাবে তা মেনে নিতে পারতাম না। তবে এক্ষেত্রে আবার আমাদের মনের জটিল অবস্থা একজন শিশু মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করে আমাদের মানসিকতা বুঝে বিভিন্ন পত্রায় আমাদের মন রক্ষা করে চলতেন। ঐ সময় মায়ের উপর আমরা বেশ নাখোশ থাকতাম। তবে অঞ্চলিক করার উপায় নেই রূবী আমার মায়ের সোনার মেয়ে হয়ে পৃথিবীতে এসেছিল। সব ভাইবোনদের মধ্যে রূবী সুন্দর, আমার মায়ের ধৈর্য ও সহ্যের প্রতীক আমাদের এ বোনটির সৌন্দর্য আর শিল্পোধ অতুলনীয়, যা আমার আবাকেও হার মানায়। রূবী লেখাপড়ায়ও অসাধারণ।

বরিশালে আসার পর জীবনের মোড় যেন ঘুরে যাচ্ছিল। অন্ধকারে বন্দী হওয়া সময় যেন নতুন আলোর সন্ধান পেতে থাকল। মায়ের বুকের গভীরের যন্ত্রণাগুলো শুকাতে শুরু করতে থাকে। বিশেষ করে বরিশালের বি-টাইপ কলোনীর বাসায় আসার পর সব কিছুর মধ্যে একটা ছন্দ ফিরে আসতে থাকে। বরিশাল বি-টাইপ কলোনীর স্মৃতিগুলো যেন মায়ের কাছে সেদিনের ঘটনার মতই নতুন। এখানে ভাল প্রতিবেশী হিসেবে পাশের ফ্লাটের প্রকোশলীর স্ত্রী, যিনি কানিজের মা হিসেবেই বেশী পরিচিত ছিলেন। এছাড়াও আরজ আলী স্যার, হাসেম স্যার, জামাল স্যার এর নাম আজও কত আপন হয়ে ছড়িয়ে আছে জীবনের পাতায়। এসব প্রতিবেশীর মধ্যে ১৯৯২ সনে বেইলী রোডে আমার সরকারী বাসার চার তলায় মকবুল সাহেবের স্ত্রীকে দেখে আমার মা বিস্ময়ে হতবাক। বি-টাইপ কলোনীতে এই মকবুল ছেলেটির বিয়ের নবোঢ়া হিসেবে যাকে মা দেখেছিলেন দীর্ঘ ৩০ বৎসর পর সেই বউকে পুরোদস্তুর গৃহিনী হিসেবে আমার প্রতিবেশী হিসেবে দেখে মা আশ্চর্য হয়েছিলেন।

পশ্চাত্ত জীবনের কঠিন সময়ের দ্বারপ্রান্ত থেকে বি-টাইপ কলোনীর এ স্মৃতিকর যাত্রায় ছেলেমেয়েদের বেড়ে ওঠার ভোরগুলো ভরে থাকত রৌদ্রকরোজ্বল সকালে। আকার একান্ত দখলে থাকা অতি পুরাণো মডেলের রেডিও থেকে ভেসে আসত সকাল নয়টার খবর। ছেলেদের ক্ষুলে পাঠাবার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত সময় গড়িয়ে মধ্যহের অলস প্রহরে মাকে কখনো আচার বালাতে, কখনো প্রতিবেশীর সাথে সুখ দুঃখের গল্পে অথবা শরৎচন্দ্র আর নীহার রঞ্জনের উপন্যাসে ডুবে থাকতে দেখা যেত। উঠতি বয়সী ছেলেদের সাথে সন্তানদের বি-টাইপ কলোনীর পুরুরে ডুব-সাঁতারে রক্তবর্ণ চোখ, অমুক চাচার বাগানের টমেটো আর কাঁচা শশা খাওয়া কিংবা প্রজাপতি আর ফড়িং এর পিছনে ছুটে ছুটে কলোনীর সীমানা ছাড়িয়ে হারিয়ে যাওয়ার স্মৃতিগুলোর দংশনে আজ আমার মা নস্টালজিক। সঙ্ক্ষয়বেলায় বাবার হংকারে ভয়ার্ট বুকে অতি সন্তর্পণে ছেলেদের মায়ের আঁচলে আশ্রয় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া দুরন্তপনায় মুখরিত ফেলে আসা দিনগুলো আজ কত না আপন হয়ে অক্ত্রিম অনুভূতিতে মায়ের স্মৃতিচারণের অংশ হয়ে আছে। এভাবে বয়ে চলা দিনগুলোর মধ্যে বি-টাইপ কলোনীতে ১৯৬৯ সনের ৩১শে জুলাই মা আরো এক মেয়ে সন্তানের জননী হলেন। আমাদের সর্ব কনিষ্ঠ বোন বেবী এল পৃথিবীতে। বেবীর জন্মের সময় আমাদের নানুকে বরাবরের মত পাশে পাওয়া গেল না। কারণ তখন বুখাইনগরে জাহানুর খালার বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। ছোট দুই বোন রংবী আর

বেবীকে লালন পালনে আমার মায়ের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। বড় ভাইয়েরা ছোট বোনদের দেখাশুনা, বাজার করা, আঘীয় স্বজনদের খেদমত ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে আমার মায়ের অনেক কাজের সুরাহা করে দিতেন। সারা জীবনের অসুস্থতা আর সাংসারিক দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে মায়ের জীবনের অর্থ যেন বদলে যেতে থাকল। বি-টাইপ কলোনীর দিনগুলো বেশ কিছু কারণে আমার মায়ের কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে তাদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সংগীত চর্চা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উপস্থিতি বক্তৃতায় পুরক্ষার প্রাপ্তি ইত্যাদি খবরগুলো আবরা আম্মা দুজনের জন্যই ছিল পরম আনন্দের। সন্তানদের গলায় ভেসে আসা গানের কলি “আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলারে ভাই, লুকোচুরির খেলা” মাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার গান শেখার সেই সুপ্ত বাসনাকে। গানের শিক্ষক অসিত স্যারের স্মৃতিগুলো মনের গহীনে ভেসে বেড়ায়। এই অসিত বাবু আবরা লেখা অনেক গানের সুরকার। আবরা লেখা সেসব গানগুলো বরিশালের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমরা সব ভাইবোন একসাথে গেয়ে অনেক সুনাম অর্জন করেছিলাম। আজ আর অসিত স্যার বেঁচে নেই। তিনি ছিলেন আমাদের সবার প্রথম গানের শিক্ষক। এভাবে সময়ের সাথে সাথে সন্তানরা বড় হয়ে উঠতে থাকে। তাদের একটু একটু করে বড় হতে থাকা, তাদের পরিবর্তিত হতে থাকার সময়গুলো যেন ঝুঁতুবদলের সাত রঙের মতই মায়ের চোখে রঙের খেলা খেলতে থাকল। ছেলে মেয়েদের ছোট ছোট সাফল্য শামসুন্নাহার বেগম পারগুলের অনেক অত্মিতির বেদনাকে যুহে দিতে থাকল। সন্তানদের পড়াশুনা এবং পড়াশুনার বাইরের সব কর্মকাণ্ডের জন্য আবরা আম্মা খুশী থাকলেও ছোট ছেলে কুট্টির ব্যাপারে হতাশা ছিল অনেক। এ হতাশা দিন দিন বেড়েই চলছিল। এ কনিষ্ঠ সন্তানটির পড়াশুনার প্রতি ক্রমাগত অমনোযোগ আবরাকে চিন্তিত ও রাগান্বিত করে তুলতে থাকে। সবার মধ্যে ছোট ছেলেটি ছিল একটি ব্যতিক্রম। তার পড়াশুনার অমনোযোগী হবার একটি ঘটনা আজও সবাই মনে রেখেছে। একদিন সকাল বেলা আবরা হঠাৎ করে সোনাভাইকে অংক শেখাতে শুরু করলেন। সোনাভাই অংকটা কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না। আবরা আবরার অগ্নিমূর্তি ও খুব ভয় পাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে আবরা জিজ্ঞেস করলেন “অসাধু দুধওয়ালা দুধে কি মেশায়।” তখন সোনাভাইয়ের উত্তর ছিল “পয়সা মেশায়।” আবরা সোনাভাইয়ের এ জবাবে রাগ না হয়ে হেসে ফেলেছিলেন। বাহ্যিকভাবে ছোট ছেলেটি অসুস্থ ও সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাকে নিয়ে সবার মধ্যে উৎকর্ষ ছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ

করে সোনাভাই টাইফয়েডে আক্রান্ত হবার ঘটনায় মা মুষড়ে পড়লেন। একদিকে ছোট মেয়ে বেবী তখন একেবারেই ছোট অন্যদিকে জ্বরে প্রলাপ বকতে থাকা অসুস্থ ছেলেকে সার্বক্ষণিক সেবাযত্তের কোন লোক ছিলনা। আমার মা কোন উপায় না পেয়ে নানুকে সংবাদ দিলেন। সেই বিপদের সময়ে দিনরাত অসুস্থ নাতির মাথায় পানি ঢেলে অক্রান্ত সেবা যত্নের মাধ্যমে সুস্থ করে তুললেন আমাদের ভাইটিকে। এ অসুখের সময়ে কোন এ্যালোপ্যাথী ঔষধ খাওয়ানো হয়নি সোনাভাইকে। আবার নির্ভরযোগ্য কে,বি,রায় ডাক্তারের সাদা গুড়ার হোমিওপ্যাথী ঔষধই ছিল একমাত্র ভরসা। তবে এ ঔষধ রোগ সারাতে কোন কাজে এসেছিল কিনা তা নিয়ে সবার সন্দেহ থেকে গেল। কে,বি,রায় ছিলেন আবার বিশ্বস্ত ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান। ছোটবেলায় আমরা কেউ তার সাদা গুড়ার মত ঔষধ থেকে রেহাই পাইনি। নকুল বাবু নামে আরো একজন ডাক্তার ছিলেন। যে কোন অসুখে নকুল বাবুর ঔষধ খাওয়া ছিল আমাদের জন্য অপরিহার্য। সোনাভাই সুস্থ হলেন। টাইফয়েড থেকে সেরে ওঠার পর ছোট ভাইয়ের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যেতে থাকল। পড়াশুনায় রাতারাতি মনোযোগী হয়ে ওঠায় ক্লাসে ভালো ফললাভ, গানে, কবিতা আবৃত্তির মত সব কিছুতেই তার অংশগ্রহণ সবাইকে বিশ্বিত করতে লাগল। সোনাভাই বদলে যেতে থাকেন। সেই সাথে সোনাভাই এর এসব পরিবর্তনের কারণে মায়ের চার ছেলে সন্তানের ব্যাপারে আর কোন ভাবনা থাকল না। বড় ভাইয়ের গান বাজনার প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা, মেজভাইয়ের হাতে তবলার তাল আর সেজভাইয়ের অসাধারণ মেধা ইত্যাদি আবরা ও আম্বার জন্য ছিল গর্বের বিষয়। আমাদের দু'বোনের বড় হয়ে ওঠার দিকগুলো সবার থেকে আলাদা। আবার অতিমাত্রায় আদর, স্নেহে আর প্রশংসায় আমরা দুই বোন কিছুটা অসামাজিক হয়ে উঠেছিলাম। এ নিয়ে মায়ের ব্যাপক অভিযোগ থাকলেও আবারকে সেসব অভিযোগ কোনরূপ ঘায়েল করতে পারত না। বাসায় মেহমানদের সাথে দেখা না করা, অল্পতেই কানাকাটি, রাগারাগি, মান অভিমান, আমাদের এহেন আচরণ ছিল মায়ের জন্য অসহনীয়। তবে আবার প্রতিরোধ বলয়ে আমাদের অবস্থান ছিল বেশ মজবুত। ভাইয়েরা আমাদের উপর বেশ ক্ষুদ্র থাকলেও কারো ‘রা’ টি করার সাধ্য ছিল না। বাসায় আবরা আর আমরা দুই বোনে মিলে মেরুকরণ হয়েছিল। মা সবসময়ই ভাইদের দলের সমর্থক ছিলেন। ছোট দুই বোন ছোট বলেই নিরপেক্ষ হিসেবে গণ্য হত।

১৯৬৭ সনের ঘটনা। সে বছর গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে বহু লোক মারা যাবার মর্মান্তিক ঘটনার কথা সবার মনে এখনো জ্বলজ্বলে। বদরপুর ধামের প্রতিটি ঘরে এ রোগে কেউ না কেউ মারা গিয়েছিল। আমাদের বাসায় তখন হাছান নামের দূর সম্পর্কের এক ভাই বেড়াতে এসেছিলেন। হাছান তার মায়ের একমাত্র ছেলে ছিল। তার বয়স আঠার বৎসর হয়ে থাকতে পারে। ধামের বাড়ী ফেরার পরই তিনিও গুটি বসন্তে মারা যান। এ মৃত্যুটি আমরা কিছুতেই মনে নিতে পারছিলাম না। শুনেছিলাম ছেলের মৃত্যুর কারণে হাছানের মা পাগল হয়ে গিয়েছিল এবং অনেক দিন পাগল অবস্থায় থাকার পর তিনিও ইন্টেকাল করেন। এ রোগের দ্রুত বিস্তার লাভে যখন গ্রামবাসী আতঙ্কিত তখন আমার বড় চাচা মরহুম মুহম্মদ ওসমান গনি আখন্দ অসুস্থ রোগীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি নিজ হাতে এসব রোগীদের সেবায়ত্ব করেছিলেন বলে আজও গ্রামবাসীর মনে তিনি অক্ষয় হয়ে আছেন। এ রোগে আমরাও অনেক আপনজন হারিয়েছিলাম।

সরকারী অফিসে চাকুরীর পদস্থ কর্মকর্তাদের বেশীর ভাগ ডি-টাইপ কলোনীতে থাকতেন। এখানকার পরিবেশ ছিল একটু আলাদা ধরনের। সন্তানদের এ ধরনের একটা সুস্থ পরিবেশে বড় হবার সুযোগ সব অভিভাবকেরই কাম্য। সে সুযোগ যেন হঠাতে করেই মিলে গেল। সন্তবত ১৯৬৯ সনের শেষের দিকে ডি-টাইপ কলোনীতে আবা সরকারী বাসা পেলেন। এ কলোনীর ভিতরে প্রচুর খালি জায়গা ছিল। কলোনীর পতিত জায়গায় আবা তাঁর চার ছেলেকে নিয়ে সবজি বাগান করতেন। বাগান করা আবার একটি প্রিয় স্থখ ছিল। সেই বাগানের তরতাজা লাউয়ের ডগা, শশা, টমেটো, কাঁচা মরিচের গাছ ইত্যাদি দৃশ্যাবলী এখনো উখলে উঠে দুচোখ ভরে। হরহামেশাই কলোনীতে ঘটত মুরগী চুরির ঘটনা। ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার জন্য চমৎকার ছিল এ কলোনীর পরিবেশ। কলোনীর গেটের সাথে রাস্তার ওপারে ছিল নজরকল পাঠাগার। এ পাঠাগারটি বরিশালের ঐতিহ্য বলা যেতে পারে। ছোটবেলায় নজরকল পাঠাগারটিকে বেশ রহস্যময় বলে মনে হত। খুব ভোরে এ পাঠাগার থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর ভেসে আসত। কিন্তু এ গান যিনি গাইতেন তাকে আমরা কোনদিন দেখেনি। ডি-টাইপ কলোনীর দিনগুলোতে জীবন আরো গতিময় হয়ে উঠল। সকাল নয়টায় আবার সেই পুরাতন মডেলের রেডিও থেকে ভেসে আসত বেতার এর সংবাদ। মায়ের হাতে রান্না গরম ভাত খেয়ে সবাই স্কুলে রওনা দিত। আমরা আবার সাথে রওনা দিতাম সাগরদী

পি.টি.আই এর পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে আর ভাইয়েরা যেতে বরিশাল জিলা স্কুলে। এই ফাঁকে আমার মায়ের ঢিলেচালা সময় কাট ছেট দুই বোন রূবী বেবীকে নিয়ে। বিকেলে কলোনীর মাঠে খেলাধুলা, বাগান করা আর গানের আসরে মেতে থাকার মধ্য দিয়ে ডি-টাইপ কলোনীর দিনগুলো হারিয়ে যেতে থাকল সময়ের আবর্তে। এ সময়ে মায়ের ভূবন পুষ্পিত হত শুধুমাত্র সন্তানদের সব কিছু ঘিরে। ডি-টাইপ কলোনীতে আমি চিকেন পঞ্জে আক্রান্ত হলে বাসায় ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আমাকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখার কারণে শেষ পর্যন্ত এ রোগ বাসার অন্য কাউকে আক্রমণ করতে পারেনি। কলোনীতে বসবাসরত সমবয়সী অনেকের সাথেই আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। সে বন্ধুত্বের শিকল স্থায়ী হয়েছিল বহুদিন পর্যন্ত। লারু ভাই নামে সোনাভাই এর এক বন্ধু যাকে আজকাল প্রায়ই টেলিভিশনে দেখি, বর্তমানে তিনি সম্ভবত সাংবাদিকতা পেশায় আছেন। তার আবার নাম মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি বরিশালের বি.এম কলেজের প্রফেসর ছিলেন। এভাবেই ডি-টাইপ কলোনীর দিনগুলো উদ্বাম বেগে ধেয়ে চলছিল। বিপদ, আপদ, সুখ দুঃখ, আনন্দ, উল্লাসের খণ্ড খণ্ড ঘটনার যোগফল নিয়েই জীবনের সমগ্রতা সৃষ্টি হয়। দুঃখ বেদনায় ভারক্ষান্ত জীবন যেমন থেমে থাকে না, তেমনি জীবনের আনন্দ মুহূর্তের ক্ষণটি স্থায়ী হয় না। জীবনের এ আলো আঁধারের খেলার মাঝেই সময় ধাবিত হতে থাকে গন্তব্যে।

১৯৭১ সাল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু। আবার ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন দেশপ্রেমিক। আবার লেখা ‘তন্ত্রের বিবর্তন’ বইটি তার প্রমাণ। এছাড়াও তিনি দেশকে নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। দেশের গান লিখেছেন বহু। তাই মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহের সাথে সাথে তিনি ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকলেন। অফিসের ছেট বড় সবাইকে বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্পন্দনে উদ্বৃদ্ধ করতে লাগলেন। আবার হঠাতে একদিন একটি স্বাধীন বাংলার পতাকা আমাদের বাসার বারান্দায় উড়িয়ে দিলেন। আমাদের ঠিক পাশের বাসায় ভিন্ন মতাবলম্বী যে পরিবারটি ছিল তাদের কাছে আবার এধরনের কার্যকলাপ কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু আবাকাকে এ কাজে কোনভাবে নিরস্ত করা ছিল অসাধ্য। সেই নিরূপায় দিনগুলোর দুঃস্মের স্মৃতি আজও মা ভুলতে পারেন না। যুদ্ধ শুরু হলে দ্রুত পালানোর প্রস্তুতি কি হবে কিংবা শক্রকে কিভাবে পরাজ করা যায় সেসব নিয়ে দিনরাত আলোচনায় ব্যস্ত থাকত কলোনীবাসী। আমরা শুধু কলোনীবাসীর উত্তেজিত আলোচনাগুলো দেখতাম। তাছাড়া

সারাক্ষণ বাসায় আবার অঙ্গুরতা ও হিমিতিদি দেখে দেখে আমরাও যেন প্রত্নত থাকতাম যে কোন বিপদ ঘোকাবেলার সাহসে। একদিন সত্য সত্য সারা শহরময় খবর ছড়িয়ে পড়ল বরিশাল পাক আর্মীরা আক্রমণ করতে যাচ্ছে। দিনক্ষণ কিংবা তারিখ মনে নেই। শুধু মনে আছে সাগরদী থেকে শহরে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কলোনীর বাসাগুলো যেন মুহূর্তের মধ্যে খালি হয়ে যেতে থাকল। সব পরিবারগুলো ছুটে পালাতে লাগল। এ অবস্থায় আবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুখাইনগর শৃঙ্খলাড়ী চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমরা সবাই সন্ধ্যার মধ্যে বুখাইনগর চলে এলাম। কিন্তু বুখাইনগরে বেশীদিন থাকা গেল না। বুখাইনগর বরিশাল শহরের কাছাকাছি হওয়ায় সেখানে বিপদের আশংকা বেশী আর সেই সাথে গ্রামের বাড়ী থেকে চাচাদের বদরপুর যাবার বারংবার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত পুরো পরিবার বদরপুর গ্রামের মৃধাবাড়ীতে আশ্রয় নিল। তখন আমাদের দোতলা ঘরটি সবেমাত্র নতুন টিনের চাল দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। আকাশে উজ্জ্বল দেয়া হেলিকপ্টার থেকে নতুন টিনের বদৌলতে ঘরটি বেশ উজ্জ্বল দেখাত। তাই এ ঘরে অবস্থান করাও বিপদজনক ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন বদরপুরে অবস্থানের সময়ে কখনো আখন্দবাড়ী আর কখনো মৃধাবাড়ী ইঁটাইঁটির কষ্ট ছিল মনে রাখার মত। মাটির রাস্তায় ভয়াত মানুষের সাথে একযোগে দ্রুত হাঁটতে গিয়ে আমার অনভ্যন্ত মা সবার পিছনে পড়ে থাকতেন। আবার শেলের ভয়ে কখনো কচুরীপানা আর জোঁকে ভরা পুরুরের পচা ও দুর্গন্ধময় পানিতে মাথা ডুবিয়ে নিঃশ্঵াস বন্ধ করে থাকার দুঃসহ কষ্টের স্মৃতি এখনো অনুরণিত হয় অস্তরের অতি গভীরে। যতদূর জানা যায় যে, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৭১ সনে পটুয়াখালী শহরে বিমান আক্রমণ ও হেলিকপ্টার থেকে প্যারাসুটে সৈন্য অবতরণ করেছিল। ঘোকরণ হাটে দু'একজনের মৃত্যুর খবর ছিল বিভীষিকাময়। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আক্রমণের আতংক আর উৎকষ্ঠার সাথে খাবারের অভাব, পানির অভাব, জ্বালানী কাঠের অভাব ইত্যাদি জীবনকে একটি অসহনীয় অবস্থায় নিয়ে যায়। ঐ সময়ে ছোট বোন বেবীর বয়স মাত্র দুই বৎসর। শিশু খাদ্যের অভাবে গ্রামীণ পরিবেশে বেবীর লালন পালন যে কতটা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল তা ছিল অভাবনীয়।

যুদ্ধ চলাকালীন এসব এবড়ো থেবড়ো সময়ের মাঝেপথে মায়ের মেজ চাচা খোন্দকার আবাদুল আজিজ ও তাঁর দুই ছেলে আমাদের প্রিয় রশীদ মায়া আর বাচু মামার মৃত্যুর খবর যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মাকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। আমার মায়ের মেজ চাচা গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। নিছক

শত্রুতাবশত এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল বলে জানতে পেরেছিলাম। রশীদ  
মামার জন্য আমাদের সবাই একটি বিশেষ মমতাবোধ ছিল। তিনি ছিলেন  
একজন রসিক মানুষ। তাঁর মত ধ্রাণবন্ত আর হাসিখুশি মানুষের এ ধরনের  
মৃত্যুর সংবাদে সবাই স্তুতি হয়ে পড়ে। এই মামার সাথে ছোটবেলা থেকে  
আমার মায়ের খুনসুটির একটা সম্পর্ক ছিল। দু'জন দুজনাকে হেনস্তা করার  
জন্য সুযোগ খুঁজতেন এমন অনেক ঘটনার কথা মা আমাদের শুনিয়েছিলেন।  
চাচাসহ দুই ভাইয়ের মৃত্যুর খবর আমার মায়ের জন্য ছিল গভীর বেদনার  
কারণ। অতি নিকটজনের নৃশংস মৃত্যুতে মায়ের রোকন্দ্যমান দৃশ্যের সাথে  
জীবনে আরো একবার মুখোমুখি হয়েছিলাম। সে কাহিনী অনেক পরের। মায়ের  
এই দীর্ঘদেহী চাচাকে আমরা দেখেছিলাম। গায়ের রঙ টকটকে উজ্জল ফর্সা।  
আমার মায়ের সখ পূরণের জন্য তিনি বরিশাল ডি-টাইপ কলোনীতে একটি  
স্পেশাল গাভী কিনে এনেছিলেন। মায়ের জন্য তাঁর মেজচাচার এ উপহারটি  
ছিল অসাধারণ ও সর্বশেষ উপহার। বরিশালের বাসায় ঐ আসাই ছিল নানার  
শেষ আসা। এরপর আর কোনদিন বরিশালে তাঁর আসা হয়নি। ডি-টাইপ  
কলোনীতে সেই গাভীটিকে নিয়ে আমাদের এলোপাথাড়ি আনন্দে মা-ও  
দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। মনে পড়ে আবার অবসরকালীন সময়ে গাভীটি  
বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। গাভীটি বিক্রির পরে সবার মন ভীষণভাবে খারাপ  
ছিল বেশ কিছুদিন।

এপ্রিলের শেষে কর্মসূলে যোগদানের জন্য আবার প্রতি কড়া নির্দেশ এলো। এ  
নির্দেশ পালন করার জন্য আবারকে বদরপুর থেকে বরিশাল যাবার মানসিক  
প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল। আবার বরিশাল আসা এবং কর্মসূলে যোগদানের কোন  
নির্দিষ্ট বাহন না থাকায় বাসায় সবাই দুশ্চিন্তায় সময় কাটাতে থাকে। আবার  
বরিশালে রওনা হয়ে গেলে গ্রামের সবাই আবার জন্য দোয়া দরং পড়তে  
থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবার পুরো পথ পায়ে হেঁটে বরিশাল আসেন। সেসব  
কষ্টের কষ্ট স্বাধীনতার পর কোন কষ্ট বলে মনে হয়নি। তবে আমাদের বাসায়  
যে পতাকাটি উড়নো হয়েছিল সেই পতাকার ভাগ্যে কি ঘটল সে ঘটনাটি  
আবার কাছে আমরা শুনেছিলাম। বরিশালে পাক আর্মী আসার আগেই সেই  
স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাটি কলোনীর আরও কিছু কর্মকর্তা মিলে অনেক  
হয়তো ধৰ্মসন্ত্ত্বে পরিণত হয়ে যেতে পারত।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মে মাসে আবৰা আবৰার বদলী হন পটুয়াখালীতে। পটুয়াখালী পি, টি, আই এর সুপারিন্টেডেন্ট এর সরকারী বাসায় অবস্থানকালে আবৰারও বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল আমাদের পরিবার। সকালবেলা বাসার গেটে পাকিস্তানী সৈন্যদের কথাবার্তায় আমরা সবাই ভয়ে অস্থির। কারণ গোপনে গোপনে শোনা যাচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য আবৰার নাম কোন এক বিশেষ তালিকায় স্থান পেয়েছে। এ সংবাদে সব সময়ই আমাদের যে কোন ধরনের বিপদের আশংকায় কাটাতে হত প্রতিদিন। আবৰাকে ভিতর থেকে ডেকে পাঠানো হ'ল। আমাদের বাসায় তখন চাচাতো, ফুফাতো ভাইসহ জোয়ান ছেলেদের সংখ্যা দশ বার জন হবে। এ দশ বার জন জোয়ান ছেলে জটলার মত একসাথে থাকায় তাদেরকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুক্তিযোদ্ধার একটি দলের মতই মনে হচ্ছিল। খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি আর লুঙ্গিপরা অবস্থায় থাকার কারণে এই দৃশ্য ছিল বিশ্বাসযোগ্য। কিছু সৌভাগ্যবশত পাক আর্মি বাসার ভিতরে প্রবেশ না করায় আমাদের পরিবারটি আসন্ন বিপদ থেকে বেঁচে গিয়েছিল। আর্মিরা শুধুমাত্র আবৰাকে অফিসে নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয়। একটি শ্বাসরন্ধকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেলাম আমরা। এ ধরনের আরো কিছু ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে আমাদের জীবন মরণের প্রশংসন জড়িয়ে পড়েছিল। পটুয়াখালী জেলখানায় পাকিস্তানী আর্মীদের একটি ক্যাম্প ছিল। একদিন রূবীকে এই ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল। তখন ওর বয়স মাত্র চার বৎসর। পাক আর্মিরা রূবীকে চকলেটসহ ফেরত পাঠালেও সেই অদমনীয় স্মৃতির দংশন এখনো মাকে অবশ করে দেয়। যুদ্ধের কারণে সব চেয়ে বড় ক্ষতি হল সেজভাইয়ার। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে অবস্থানের কারণে সেজভাইয়ার জীবন কিছুটা এলোমেলো হয়ে পড়েছিল। তার বন্ধুবান্ধব এর গভি এতটাই বিস্তার লাভ করেছিল যে, তিনি লেখাপড়ার প্রতি বেশ অনাবস্থী হয়ে পড়তে থাকেন। সব কিছুতেই কিছুটা সীমা লজ্জনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। সেজছেলের এ পরিবর্তনের বিষয়গুলো মা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ম্যানেজ করেছিলেন যাতে সেজভাইয়া আরো বিগড়ে না যান। আবৰার কাছ থেকে কিছু বিষয় গোপন রেখে বন্ধু বান্ধবের অসৎ সঙ্গ থেকে সেজভাইয়াকে শিখিয়ে আনার ক্ষেত্রে আমার মায়ের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের কোন ভুল বা অনিয়ম নিয়ে রাগারাগির পরিবর্তে মা সম্পূর্ণ বিপরীত কৌশল অবলম্বন করতেন। মা এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতেন আর সন্তানদের ছোটখাট ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করতেন। মা মনোবিজ্ঞানী না হয়েও সন্তানদের লালন পালনে যে প্রজ্ঞা ও উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছেন তা কখনো কখনো আবৰার মত

শিশু মনোবিজ্ঞানীকে হার মানিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে নিজের ভাইবোনদের বড় করার অভিজ্ঞতা মা সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন নিজের সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে।

অবশ্যে শেষ হল যুদ্ধ। পালিয়ে বেড়ানো জীবনের অবসাদ, ক্লান্তি আর আতঙ্কের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা এল। বাংলাদেশের পৃথিবীটা বদলে যেতে শুরু করল। এ দেশের মানুষ, নদনদী, গাছপালা, আকাশ বাতাসে প্রাণের স্পন্দন তরঙ্গিত হতে লাগল। এ সময় যুদ্ধে ক্ষতিহস্ত ও স্বজনহারাদের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞানার সুযোগও পাওয়া গেল। মনে পড়ে মায়ের কাছে অপরিচিত একজন মহিলা পটুয়াখালী জেলখনার পাশে গণকবরের জীবন্ত বর্ণনা দেবার সময় আমরা সবাই ডয়ে শিউরে উঠেছিলাম। গণকবরের বিবরণী শুনে আমরা পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতন, অত্যাচার আর নৃশংসতার যে পরিচয় পেয়েছিলাম আজও সে ছবি মনকে বিদীর্ণ করে। স্বাধীনতার পরে জীবন্যাত্মায় পূর্বের নিয়ম কানুন ফিরে এল। ক্ষুলে যাওয়া শুরু হল ভাইদের। ভাইয়া এবং মেজভাইয়া ইতোমধ্যে এস,এস,সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পটুয়াখালী সরকারী কলেজের ছাত্র হয়ে গেলেন। সেজভাইয়া ও সোনাভাই দুজনেই জুবলী ক্ষুলের ছাত্র। সেজভাইয়ার লেখাপড়া গাফিলতি এলেও লেখাপড়া ও অন্যান্য পারফরমেন্সের কারণে সোনাভাই সবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হ'ল। হঠাতে করে একদিন জাতীয় সংবাদের শিরোনামে সোনাভাইয়ের নাম ও ছবি দেখে হতবাক সবাই। তিনি পটুয়াখালী জেলার খেলাঘর থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাইকৃত একজন হয়ে এক মাসের জন্য খেলাঘর এর দাদাভাই (মরহুম রোকনুজ্জামান খান) এর সাথে রাশিয়ার আর্টেকে যাচ্ছেন। সাথে যাচ্ছেন দাদা ভাইয়ের মেয়ে মিতি, ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ এবং আমিনুল ইসলাম। পটুয়াখালী জেলা থেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে সোনাভাইয়ের মনোনয়ন তখনকার সময়ে একটি জবর খবর হিসেবে ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরবর্ষ। এ নিয়ে বেশ হৈচও পড়ে গিয়েছিল। আমার মা তার ছোটবেলার অসুস্থ আর দুর্বল ছোট ছেলের অসাধারণ হয়ে ওঠার ঘটনাগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সোনাভাইকে ঢাকা নিয়ে যাবার বিশাল আয়োজনে আমার আববার ব্যস্তসমস্ত ছোটাছুটি মায়ের চোখে এখনও স্ফটিকের স্বচ্ছতায় ভেসে বেড়ায়। এরপর আমাদের সোনাভাই শুধু এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে। তখন থেকে তার অবিশ্রান্ত অগ্রযাত্রায় আর কোন ছেদ পড়েনি।

মায়ের আদরের ছোট ভাইয়ের প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি। ইত্যাবসরে তিনি আমাদের বি-টাইপ কলোনীর বাসা থেকে ১৯৬৯ সনে এইচ এস সি পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফল অর্জন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হলেন। তবে তার বুয়েট পড়ার কথা থাকলেও তা কেন হ'ল না সেটি স্পষ্ট করে জানা যায়নি। আবু মামা তখন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছোট মামার ঢাকা পড়তে আসার প্রাসঙ্গিকতা কোনভাবে উপেক্ষা করার উপায় ছিল না বলেই শেষ পর্যন্ত আবু মামার দায়িত্বে ছোট মামাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেল। ছোট মামা ঢাকা আসার পর কিছুদিন পর্যন্ত যোগাযোগ অব্যাহত থাকলেও ধীরে ধীরে এ যোগাযোগে গা ছাড়া ভাব শুরু হ'ল। যে আশা নিয়ে ছোট ভাইকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল সে আশা ধীরে ধীরে নিরাশায় রূপ নিতে থাকল। নিরাশার অক্ষকার আরো গভীরতর হ'ল যখন মামা ভারতেশ্বরী হোমস এ পড়ুয়া মাহমুদা বেগম (খুকু) কে বিয়ে করে সবার সব স্বপ্নের সমাপ্তি ঘটালেন। ছোট ভাইয়ের এ পরিণতির ক্ষেত্রে বড় ভাই খোদকার সিরাজুল ইসলাম আবু এর দায়িত্ববোধের প্রশ়ঁস্তি থেকেই গেল। বিয়ের পর পশ্চাং জীবনের সব হিসেব নিকেশ মিটিয়ে ছোট মামা হয়ে গেলেন অপ্রতিহত এক অভিলাষী জীবনের অসর্তক যাত্রী। ছোট ভাইয়ের এহেন অন্তর্ধানে মায়ের অবারিত স্বপ্নের অবসান হলেও বিভাবী শেষে আলো ফুটবেই এমন অব্যক্ত আশা নিয়ে মা অপেক্ষায় রইলেন। আমার মায়ের সেই আশা পূরণের গল্লে ফিরে আসব পরের অংশে। পটুয়াখালীর বাসাটি ছিল চমৎকার। বাসা থেকে গেট পর্যন্ত পায়ে চলা লাল সুরক্ষীর সরু রাস্তা। এ রাস্তার শেষ প্রান্তে একই মাপের দুইটি তাল বেতাল গাছ (Palm tree) আকাশের উচ্চতায় দাঁড়িয়ে ছিল। এর সামনেই হাজার পদের মাছে ভরা বিশাল পুকুর। ছুটির দিনে বড়শি নিয়ে ঠাঁয় পুকুর পাড়ে বসে থাকতেন ভাইয়েরা। এই পুকুরে বড় বড় মাছের ছবি এখনও কল্পনায় ভাসে। পটুয়াখালীতে যাদের সাথে খেলতে খেলতে বড় হয়েছি সেই মনি, ফরিদা, রীনা, বেবী নামের বাঙ্কবীরা আজ কোথায় আছে জানা নেই। স্বাধীনতার পর আবার বরিশালে আগষ্ট, ১৯৭৪ সনে বদলী হওয়ায় পটুয়াখালীর সাথে যোগাযোগ কমে এল। তবে পটুয়াখালীতে বসবাসের সময়গুলো বিভিন্ন কারণে বেশ মনে রাখার মত হয়ে উঠেছিল। দাদীর নামে আমাদের ধামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত সরকার থেকে অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু দাদীর নামে বিদ্যালয়টির নামকরণের কথা থাকলেও

বিদ্যালয়টি দাদীর নামে হয়নি। হয়তো কাগজপত্রের কোন ভুলের কারণে এরকম হয়ে থাকতে পারে। এই বিদ্যালয়টি স্থাপনে আমার মায়ের নেপথ্য ভূমিকার কথা আজও সবাই মনে করে। এ বিদ্যালয়টিতে সরকারী অনুমোদন পেতে দীর্ঘ কয়েক বৎসর সময় লেগেছিল। এ সময়ে মা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে গ্রাম থেকে আগতদের সময় দিতেন। এমনকি মধ্যরাতেও কখনো কখনো মাকে অতিথিদের জন্য রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। এছাড়া বাদশা, মঞ্জুর, ফারুক দাদা ও শহীদ দাদাদের পড়াশুনার গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল আমাদের বাসায়ই অতিবাহিত হয়েছিল। এসব চাচাত, ফুফাত ভাইয়েরা এখন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন। তারা কেউই আমার মায়ের অবদানের কথা ভুলে যাননি। সেসব দিনগুলোতে আমার মায়ের ধৈর্য ও কষ্টের অতিদান হিসেবে আজীয় স্বজন আজও আমার মাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। সময় অসময়ে তাদের হাজার ধরনের সমস্যা সমাধানে আব্বা ধৈর্যহারা হলেও মা ধৈর্য হারাননি। ২০০৪ সনে আব্বার মৃত্যুর পর বদরপুর যাওয়া উপলক্ষে বার কয়েক পটুয়াখালী ঘুরে আসার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু পুরাণো সেই বাসা, পুকুরঘাট, তালবেতাল গাছ কোন কিছুই আর আগের মত নেই। সময়ের সাথে সাথে সব কিছুই বদলে গেছে। এই বদলে যাওয়াটাই সত্য এবং স্বাভাবিক। আর এসব বদলে গেল বলেই আমরা স্মৃতির কপাট খুলে রাখি আর সেসব দিনে ফিরে ফিরে আসি।

বরিশালে আব্বা সাগরদী পি, টি, আইতে আবার সুপারিন্টেডেন্ট হিসেবে যোগদান করেন ১৯৭৪ সনে স্বাধীন বাংলাদেশে। এবার আর আমাদের ডি-টাইপ কলোনীতে থাকা হ'ল না। আমরা সাগরদী পি, টি, আই এ দুইটি অব্যবহৃত কক্ষকে বাসা বানিয়ে তাতে উঠলাম। বাসাটি চমৎকার আর আলো বাতাসের ছড়াছড়িতে পরিপূর্ণ। সামনে খোলা সবুজ মাঠ। মহিলা শিক্ষার্থীদের হোস্টেল তৈরী হওয়ায় এ সবুজ মাঠটি পরে হারিয়ে গেল। সবুজ মাঠের ওপারে ছোট ছোট ঘরবাড়ীগুলো ছবির মত দাঁড়িয়েছিল। পরে সেসব ঘরবাড়ীগুলো পি, টি, আই এর সীমানা প্রাচীর তৈরীর কারণে দৃষ্টি সীমানার বাইরে চলে গেল। তবে এসব বাড়ীর কেউ কেউ মনের সীমানার বাইরে যেতে পারেননি। এর মধ্যে বুলু আপার নাম অনেক নামের ভাড়ে এখনও স্পষ্ট। তিনি আমাদের চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় হলেও কি এক অজানা আকর্ষণে আমরা দুবোন সবসময় তার সব কথা গোঁথাসে গিলতাম। তার কথা বলার চঢ়িতে বোধ করি কোন যাদু ছিল। সেই যাদুর টান এখনো আটুট বলেই তাকে ভোলা হল না। আমার

মায়েরও সে প্রিয়পাত্র। মায়ের সামান্যতম কোন অসুস্থতার সংবাদেও ভীষণভাবে অস্ত্রি হয়ে পড়া প্রিয় মানুষের মধ্যে তিনি একজন। তার সাথে আমাদের যোগাযোগ অব্যাহত আছে। অনাচ্ছীয় এমন মানুষের সাথে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব হয় যখন সম্পর্কগুলো সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করে প্রসারিত হতে থাকে বহু দূরে।

বরিশালের সময়গুলো নতুন ধরনের সমস্যা নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকল। সংসারের টানাপোড়েনে যে মা দুদুড় অবসর কাটানোর সময় পাননি এবং সন্তানদের লালন পালনে জীবনের বেশীর ভাগ সময় নিঃশেষ করেছেন সেই মা-ই আবার সন্তানের বড় হতে থাকার সময়গুলোতে মা হিসেবে নিজের দায়িত্বের পরিবর্তন উপলব্ধি করতে থাকেন। সন্তানদের বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে তাদের লেখাপড়ার তদারকি, বন্ধুবান্ধব নির্বাচন, পছন্দ অপছন্দের বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় করে ভারসাম্য বজায় রাখার কৃতিত্ব অবশ্যই আমার মায়ের প্রাপ্য। এ সময় ভাইয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার প্রস্তাবে আকরার উৎসাহের অভাব না থাকলেও এ প্রস্তাবে মা নিস্পত্তি থাকলেন। মায়ের মধ্যে উৎসাহবোধের অভাব অনেক কারণেই হতে পারে। আপাতদ্বিত্তে মায়ের নির্লিঙ্গিতা আমাদের কাছে অযৌক্তিক মনে হলেও মায়ের সেই নির্লিঙ্গিতার কারণ পরে বোধগম্য হয়েছিল যখন ভাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা ক্ষাণ্ট দিয়ে আরো দূরে পাড়ি জমালেন। অন্যান্য ভাই বোনদের মত তার আর দেশে থাকা হ'ল না। তখন বুঝতে বাকী রইল না মায়ের সেদিনের নীরবতার মধ্যে বড় সন্তানকে নিজের কাছে রাখার প্রচলন আকুলতা ছিল কতটা ধ্বল। ভাইয়ার ঢাকা পড়াশুনা করার শত যুক্তির কাছে সে প্রবল আকুলতা প্রকাশ না করতে পারার অক্ষমতায় মা ছিলেন সেদিন নীরব, নিস্পত্তি। মক্ষোর প্যাট্রিস লুবুষা গণমেত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশুনার জন্য ভাইয়া ১লা আগস্ট, ১৯৭৫ সনে রাশিয়া চলে যান। ঐ সময়ে বাংলাদেশ থেকে অনেক তরফ এবং মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের রাশিয়ায় বৃত্তি নিয়ে চলে যাবার হিড়িক পড়েছিল। আমাদের সবার বড় ভাইয়া আরো বড় দূরত্বের সীমানা রচনা করেন যখন, তিনি রাশিয়ায় মারিয়া (মাশা) নামে এক প্রকৌশলীকে বিয়ে করে রাশিয়ার নাগরিকত্ব লাভ করেন। বিদেশী ভাবী বাংলাদেশে দুইবার এসেছিলেন। বাঙালী হ্বার অনেক চেষ্টা তার মধ্যে দেখেছি। পরে ভাইয়া রাশিয়ায় অর্থনীতিতে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন এবং সেখানেই চাকুরী করতে থাকেন। রাশিয়ার বিভক্তির পর তিনি মার্চ, ২০০৩ সনে সপরিবারে কানাডা চলে আসেন। সেই থেকে তিনি

কানাড়া নিবাসী। ভাইয়ার মত অন্য কোন ভাই স্থায়ীভাবে দেশের বাইরে স্থায়ী না হলেও চাকুরীর কারণে সব ভাই বিদেশে যাবার এবং পড়াশুনার অনেক সুযোগ পেয়েছেন। বৃহত্তর স্বার্থে সন্তানদের দূরে চলে যাবার বিষয়টি বাস্তবতার খাতিরেই মাকে মেনে নিতে হয়েছিল। তবে মেজছেলের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে দৃশ্যপট ছিল ভিন্ন। মেজছেলে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় ঢিকে গেলেন। তার মেডিক্যালে পড়াশুনার ব্যয়ভার প্রচুর হলেও তা নির্বাহ করার মনোবল হারালেন না আববা আম্মা। কখনো বাসায়, কখনো হোস্টেলে থেকে মেজছেলে মুস্তাফা মাহবুব মেডিক্যালে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে থাকেন। বরিশালে পড়ার কারণে মা নিজের কাছে পেলেন মেজ ছেলোটিকে।

বড় ও মেজ ছেলের পরে সেজ ছেলের অবস্থান। মায়ের দুর্বল স্থানটি সেজ ছেলের অধিকারে। সব সন্তানরা সবদিক থেকে এগিয়ে গেলেও সেজ ছেলের ক্ষেত্রে সবকিছু পিছিয়ে যাচ্ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকেই সেজ ছেলের বন্ধনহীন জীবনপথবাহকে স্বাভাবিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে আমার মায়ের অগাধ দুর্দর্শিতা ছিল। অসাধারণ মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি লেখাপড়ার আগ্রহ হারিয়ে বন্ধু বাক্সের সঙ্গাতে বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন, আসক্ত হয়ে পড়েন ধূমপানে। সংকটময় মুহূর্তে মায়ের কঠিন নজরদারীতে সেজ ছেলের বোধশক্তিকে জগ্নিত করা সম্ভব হয়েছিল। অন্যান্য ভাইদের মত তিনি নিয়মিত ছাত্র হিসেবে পড়াশুনা শেষ করতে পারেননি। নিজের ইচ্ছেমত চলার স্বাধীনতা পেতে তিনি যখন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতার চাকুরী নিয়ে প্রত্যক্ষ গ্রামাঞ্চলে চলে যান আমার মা তখন আশাবাদী ছিলেন যে সেজভাইয়াও আববাৰ মত একদিন নিজের চেষ্টায় বড় হবে। জীবনের গতিপথবাহে এমন ভাঙাগড়ার কারণে মা সবসময়ই তার সেজ ছেলোটিকে বিভিন্নভাবে আগলে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। বলাবাহ্ল্যে তার প্রতি মায়ের অতিরিক্ত যত্ন, সমর্থন কিংবা দুর্বলতার কারণে মাকে প্রায়ই তির্যক বাক্যবাণে ঘায়েল করতাম আমরা। মা সব কিছু হাসিমুখে মেনে নিতেন।

সোনাভাইয়ের বিষয়ে আববা আম্মা দু'জনেই চিন্তামুক্ত ছিলেন। তিনি নিজের ভালমন্দের বিষয়ে এতই সচেতন ছিলেন যে এ ব্যাপারে কারো কোন ভূমিকা নেবার প্রয়োজন পড়ত না। এইচ,এস,সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে কোথায় ভর্তি হবেন এমন দোমনা অবস্থায় তিনি কোন প্রস্তুতি ছাড়াই বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। তখনকার সময়ও

মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষা বেশ প্রতিযোগিতামূলক থাকায় সুযোগ পাওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু সোনাভাই ভর্তি পরীক্ষায় উতরে যান। যদিও আবার পক্ষে ছোট ছেলেকে মেডিক্যালে পড়ার খরচ চালানো সম্ভব হবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তথাপি সোনাভাই বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি মাস মেডিক্যালে পড়াশুনার পর হঠাতে করে যখন তিনি মেডিক্যালের পড়াশুনা ছেড়ে কমিশন পদে সেনাবাহিনীতে যোগদানের ইচ্ছাটা বাসায় প্রকাশ করে ফেললেন, তখন বিষয়টি নিয়ে বাসায় আলোচনার বাড় উঠল। বিশেষ করে মা ছোট ছেলের সেনাবাহিনীতে যোগদানের বিষয়ে ঘোর আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদানের স্বপক্ষে অগণিত যুক্তি প্রদর্শন শেষে মায়ের অনিচ্ছাতেই ছোট ছেলে ১৯৭৮ সনের ২৩শে জুলাই ভাটিয়ারিতে যোগদান করেন এবং ১৯৮০ সনের ১০ই জুন কমিশন প্রাপ্ত হন। ছোট ছেলেটির সব কিছুতেই তাড়াহুড়োর বিষয়টি মা নীরবে লক্ষ্য করে আসছিলেন। হঠাতে করে সেনাবাহিনীতে যোগদানের অন্য কোন কারণ থাকতে পারে বলেও মায়ের মনে সন্দেহের দানা বাসা বাঁধতে থাকে। ডাক্তার হতে ছোট ছেলের চার থেকে পাঁচ বৎসর সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীতে যোগদানের কারণে মাত্র দুই বৎসরে কমিশনপ্রাপ্ত হয়ে উপার্জন করতে সক্ষম হয়ে গেলেন ছোট ছেলেটি। লেখাপড়া কিংবা পেশা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সন্তানদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল বলেই এ নিয়ে আলোচনা নিরুত্তেজ হয়ে পড়ে। তবে সেনাবাহিনীর চাকুরীতে যথেষ্ট আরাম আয়েস, সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও মাকে কখনোই এ চাকুরীর স্বপক্ষে সাফাই গাইতে দেখিনি। আমার মায়ের ইচ্ছাগুলো ছিল অতি সাধারণ। সন্তানদের শিক্ষকতা পেশায় দেখতেই তিনি বেশী আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সেই সাধারণ ইচ্ছাগুলোও ধীরে ধীরে নিতে যেতে থাকল। ছোট মাঝা উচ্চতর পড়াশুনার জন্য ঢাকা চলে যাবার পর মায়ের অন্তর্জ্ঞতে এটি বদ্ধমূল হয়েছিল যে, একবার ঢাকার জীবনে অভ্যন্ত হয়ে গেলে কেউ আর পৈত্রিক ঠিকানায় ফিরে আসে না। আপনি দুই ভাইয়ের উদাহরণই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট। এ কারণেই সন্তানদের কোন অজুহাতেই দূরে পাঠাতে আমার মায়ের ছিল শত সহস্র আপত্তি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সময়ের দাবীতে এবং জীবনের প্রয়োজনে একমাত্র সেজ ছেলে ছাড়া অন্য কেউ আর মায়ের কাছে স্থায়ীভাবে থাকতে পারেনি।

চার.

চার মেয়েকে নিয়ে মায়ের জীবনে তেমন জটিলতার সৃষ্টি হয়নি। চার মেয়েই নির্বিবাদে বরিশালের ব্যান্ডিস্ট মিশন গার্লস স্কুলের কড়া নিয়ম কানুনের মধ্যে এস,এস,সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বরিশাল মহিলা কলেজে পড়াশুনা করতে থাকল। আবার কাছে মেয়েরা ছিল তুলসী ধোয়া পাতার মতই নিষ্পাপ। অতিরিক্ত গল্লের বই পড়ে পড়ে মেয়েদের কল্লনার জগতে বিচরণের অভিযোগে মা ছিলেন সোচ্চার। পরবর্তী জীবনে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে গিয়ে মায়ের সেসব অভিযোগের সত্যতা টের পেয়েছিল মেয়েরা।

দেখতে দেখতে মায়ের জীবনের অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। সন্তানদের পড়াশুনার অধ্যায়ও ধীরে ধীরে সমাপ্তির পথে চলে আসতে থাকল। পড়াশুনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সন্তানদের ক্রমাগত সফলতা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলছিল। একজন মায়ের জন্য সন্তানের সফলতার চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছু নেই। সন্তানদের বিপদ আপনের হাত থেকে রক্ষায় আল্লাহর দরবারে থার্থনায় মগ্নি থেকেছেন আমার মা। সংসারে অভাব অন্টনের সাথে যুদ্ধ করেই আমরা বড় হয়েছি। আমাদের অনেক আবদারই পূরণ হয়নি সময়মত। তারপরও মা সেই অভাবের মধ্যেও আমাদের সুখী ও সুন্দর জীবনের পথ দেখিয়েছিলেন। আমরা অল্লতেই তুষ্ট ছিলাম, সব কিছুই মিলে যিশে ভোগে বিখ্যাসী ছিলাম। অনেক দিনের একটি অপূর্ণ আবদার যখন হঠাতে করেই পূরণ হয়ে গেছে তখন তা যেন সোনার হরিগ পাওয়ার আনন্দের মতই আপূর্ত করেছে সবাইকে। আমার মায়ের স্মৃতিতে সন্তানদের সেই আনন্দমাখা মুখখানি এখনো অজ্ঞান। আজ আনন্দের ধরনও যেন বদলে গেছে। পরিবারের সংজ্ঞায় এসেছে পরিবর্তন। পরিবর্তিত সমাজে বেড়ে ওঠা ছেলে মেয়েদের পছন্দ, অপছন্দ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আনন্দ বেদনা সব কিছুকেই ঝাস করেছে আত্মকেন্দ্রিকতা। মনের গহ্বর পূর্ণ হয় না অনেক প্রাপ্তির আনন্দেও। সব কিছু হিসেব নিকাশের কঠিন নিয়মে বাঁধা। নতুন নতুন ইনোভেশন আজ জীবনকে দিয়েছে গতি, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম আর পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে অন্য এক পৃথিবী আবিঞ্চারের নেশা। সে নেশায় প্রকৃতির অগোছাল নেসর্গিক শোভা অনিন্দ্য হয়ে কোন আবেদন রাখে না মনের রাজত্বে। হারিয়ে যেতে থাকে অন্তরের কোমলতা। অরণ্য হয়ে যায় শুক্ষ এবং যান্ত্রিক।

সাগরদী পি,টি আই থেকে আববার অবসর নেয়ার সময়টি ছিল আমাদের সবার জন্য বড় অসময়। কারণ আমরা সবাই তখন পড়াশুনার মাঝপথে। মেজছেলের ডাক্তারী পড়া শেষ হতে তখনও এক কি দেড় বৎসর বাকী। সেজছেলের বি,এম কলেজে বিএসসি অথবা অন্য কোন বিষয় পড়াশুনার জোর চেষ্টা তাদ্বির চলছে। ছোটছেলের ট্রেনিং শেষ হয়নি। আমরা চার বোন ক্ষুল কলেজের চৌকাঠ পেরতে পারিনি। সংসার তরণী সবে তীরে পৌছানোর অপেক্ষায় মাত্র। সন্তানদের লেখাপড়ার অনিচ্ছয়তার পাশাপাশি সরকারী বাসা ছেড়ে দেবার মত কঠিন সমস্যার কথা চিন্তা করে সবাই কিংকর্তব্যবিমৃঢ়। সরকারী বাসা ছেড়ে দিয়ে খুঁজতে হবে নিজস্ব আবাসন। দশ বার জনের একটি বাড়ত পরিবারের জন্য শহরে এ ধরনের বসবাসযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার মত বৈষয়িক ভাবনা তখনো আববার মাথায় ঠাই নেয়নি। সংসারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায় দায়িত্ব বরাবরই মায়ের হাতে ন্যস্ত ছিল। আট সন্তানের লেখাপড়ার খরচ, আজীয় স্বজনকে বিপদ আপদে হঠাত করে সাহায্য করা কিংবা সংসারের বহুবিধ চাহিদা মেটাতে গিয়ে আববার সারাজীবনের চাকুরীর অর্থ থেকে কোন সংশয় করার কথা ছিল ভাবনা উদ্ধৰে। চাকুরীতে একজন সৎ ও সুদৃঢ় কর্মকর্তা হিসেবে আববার সুনাম ছিল সত্য। কিন্তু তিনি তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের মত কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি তৈরী করে নিশ্চিত ও নিরাপদ ভবিষ্যত গড়ে তোলার সুনাম অর্জন করেননি। তাঁর আয়ের বেশীর ভাগ অর্থ ব্যয় হয়েছে সন্তানদের পড়াশুনার খরচ মেটাতে। তাই সরকারী বাসা ছেড়ে যখন নিজ বাসস্থানে মাথা গাঁজার মত কঠিন বাস্তব সামনে চলে এল তখন শূন্য হিসেবের খাতাটি চোখের সামনে তুলে ধরে হিসাব মেলাতে শুরু করেন আববা আম্মা। কিন্তু কোন হিসেবই আর মেলে না। কপর্দক শূন্য অবস্থায় বরিশালে ভাড়া বাসায় থাকার মত সাহস দেখাতে রাজী হননি আববা। তিনি বরিশালের পাট চুকিয়ে সোজা বদরপুর ধারে সবাইকে চলে যাবার সহজ সরল পথ বাতলে দিলেন নির্দিষ্টায়। কিন্তু বদরপুরে স্থায়ীভাবে চলে যাওয়া অর্থ জীবনের চলমান গতিকে প্রতিহত করা। অধ্যয়নরত সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবার ঘোল আনা সন্তান। সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে এ যুক্তিতে বরিশাল ছেড়ে কোথায়ও না যাবার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন মা। মায়ের এ অবাস্তব সিদ্ধান্তে আববার সাথে মায়ের মত দৈততার সৃষ্টি হলেও মায়ের যুক্তির কাছে আববা শেষ পর্যন্ত হার মেনে নিয়েছিলেন। আমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষ করেছি। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটবে বলেই মায়ের এ সাহসী পদক্ষেপ ছিল আববার মতামতের বিপক্ষে। মা নিজে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি বলেই

হয়তোবা সন্তানদের লেখাপড়ায় ছাড় না দেয়ার এমন মানসিক শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন। তবে একথাও ঠিক সে সময় বরিশালে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেয়া ছিল মায়ের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। সরকারী বাসাটি ছেড়ে দেবার সময় আবাও ছিলেন ঢাকা। মা একাই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য মায়ের কাছে আমরা শ্রদ্ধাবন্ত। এরকম এক কঠিন সময়ে মা-ই বের করলেন বরিশালে বসবাসের একটি সন্তাননাময় সমাধান। তিনি খুঁজে বের করেছিলেন আবাও সেই বাল্যবন্ধুকে যার নাম আবদুল খালেক। যিনি কোন এক সময়ে আবাওকে জোর জবরদস্তি করে বরিশালের আলেকান্দার কাজী বাড়ীতে একখন্ড জমি কেনাতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পরে আবদুল খালেকের সেই উপকারটি আমার মায়ের চোখের সামনে আশার আলো হয়ে ফুটে গঠে। সেই অদেখ্য আর অযত্নে পড়ে থাকা জমিটি সম্ভল করেই বরিশালে বসবাসের ব্যবস্থাটি পাকাপোক্ত করে ফেলেন মা বরিশালের আলেকান্দার কাজী পাড়ার সেই নয় শতাংশ জমিতে। এসব কৃতিত্ব একান্তই আমার মায়ের। মায়ের এমন দৃঢ় মনোবল না থাকলে হয়তো বদরপুর থামের সীমানা ছড়িয়ে আমাদের পক্ষে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ তৈরী হত না। সরকারী বাসার আরাম আয়েশ ছেড়ে হঠাত করে একটি ছোট ঘরে সবাই মিলে বসবাসের অপরিসীম কষ্ট মেনে নেবার শক্তিও ঘুণিয়েছেন আমাদের মা। সব পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেয়াই সত্যিকারের শিক্ষা, এমন শিক্ষাই তিনি সন্তানদের অন্তরে বিছিয়ে দিয়েছিলেন। আর শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত দিনে আবাওর অনুপস্থিতিতে মা আমাদের সবাইকে নিয়ে সাগরদী পি, টি, আই এর বাসাটি ছেড়ে চলে এলেন কাজী পাড়ার সেই মাটির কাঁচা ঘরটিতে। এ ঘেন স্বর্গ থেকে হঠাত মর্তে পড়ে যাবার একটি অবস্থা। একদিকে অতি পরিচিত প্রিয় পরিবেশ সাগরদী থেকে বিদায় নেবার বেদনা, অন্যদিকে সদ্য তৈরী করা ছোট ঘরটিতে থাকার কষ্ট, এ দুয়ে মিলে জীবনের এ বিশেষ সময় স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে আজতক। আমাদের সবার জন্য এ ছিল এক কঠিন সময় অতিক্রমের যন্ত্রণা। সাগরদী পি, টি, আই এর প্রতিবেশী জামাল স্যারের মেয়ে নাসিমা, পুস্প, খুকু, রোজী ও ছবিদের ছবি ভুলতে পারিনি আজও।

নতুন বাসায় অবস্থানের প্রথম দিকের কষ্টের অভিজ্ঞতাগুলো ছিল মধুতে মাঝ। এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল আমাদের দু'বোনকে নিয়ে। নতুন বাসায় স্থানান্তরের দুই একদিন পরের ঘটনা। পড়া বিকেলে বাসায় গিয়ে দেখি কলেজ থেকে দুই বোনের দেরীতে বাসায় ফেরার কারণে মা ভীষণভাবে

উৎকর্ষিত। আমাদের সাথে ইসহাক ভাইকে দেখে মা বিস্মিত। কারণ ইসহাক ভাইয়ের বাসা সাগরদী পি, টি, আই এর হোস্টেলে। তিনি সেখানে পরিবারসহ থাকতেন। ইসহাক ভাই আবার অনেক দিনের বিশ্বস্ত পিয়ন হিসেবে আমাদের পরিবারের অতি নিকটজনে পরিণত হয়েছিলেন। কলেজের পথ আর সাগরদী পি, টি, আই এর পথ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তাই আমাদের সাথে ইসহাক ভাইয়ের দেখা হবার কোন সুযোগই ছিল না। আমরা দুইবোন নতুন বাসার পথ হারিয়ে পুরানো বাসায় অর্থাৎ সাগরদীতে চলে যাবার কারণেই সেদিন অসময়ে ইসহাক ভাইকে দেখে মা হতবাক হয়েছিলেন। এরপর আরো দুই একবার হারিয়ে যাবার পর কাজীপাড়ার লাল ইটের সরু রাস্তাটি আর ভুল করিনি আমরা। কাজীপাড়ার বাড়ীটিও ধীরে ধীরে আপন হয়ে যেতে থাকল। বাড়ীর সামনে খোলা মাঠে বিকেল বেলায় নীরু আপা, মানু আপা, ডলি, মামুনদের সাথে দাঁড়িয়াবান্দা খেলার স্মৃতিগুলোতে একটুও মরচে ধরেনি। সন্ধ্যায় হারিকেনের আলোতে পড়তে বসা, টিনের চালে বৃষ্টির রিমবিম গান, বন্যার পানিতে উঠোন সয়লাব হলেই সাপের ভয়, মাটির চুলোয় শীতের দিনে উঠোনে রান্না ইত্যাদি সবই ছিল জীবনে নতুন সংযোজন। জীবনের রঙ যেন সময়ের কারণেই বদলে যেতে থাকল। পরিপূর্ণ এক আলোকিত জীবনের জন্য প্রকৃতির এত কাছে আসার প্রয়োজন ছিল বৈকি। সরকারী বাসার চার দেয়ালে কখনোই প্রকৃতিকে এমন ভাবে অনুভবের সুযোগ হয়নি। ঘরটি ছোট হবার কারণে ভাইবোনরা যেন আরো ঘনিষ্ঠ হতে থাকলাম। একজনের দুঃখ, কঠের গল্প বা আনন্দের ঘটনা যেন সবার ঘটনা হয়ে যেতে থাকল। সম্পর্কগুলো মধুর থেকে মধুরতর হয়ে উঠতে থাকে।

ছোট আর কাঁচা ঘরটিকে পাকা করার জন্য আবার গ্যাচুইটির অর্থ প্রাণ্ডির অপেক্ষায় ছিলেন মা এবং আমরা সকলে। আবা অসীম ধৈর্যের সাথে ঢাকা একমাস অবস্থান করে পেনশন কেস বিনা অর্থ ব্যয়ে অনুমোদনে সক্ষম হয়েছিলেন। নিজের সততার জন্য আবার মধ্যে অহংবোধ এমন মাত্রায় পৌছেছিল যে, কাউকে মুশ দেবার বিষয়টি তিনি চিন্তা করলেও উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। আমার মায়ের প্ল্যান ছিল আবার পেনশন আর গ্যাচুইটির টাকা হাতে এলেই কাঁচা ঘরটি পাকা করে একটু বড়সড় বাসস্থান তৈরী করা হবে। বাড়ী তৈরীর বিষয়গুলোতে সেজ ছেলের বেশ আগ্রহ থাকায় মা এসব ব্যাপারগুলো তার সাথে আলাপ করতেন। সেজ ছেলে আর মায়ের চেষ্টায় বাড়ীর একটি নকশা তৈরী করা হয়। আবার ইচ্ছানুযায়ী বাড়ীর নামকরণ

হ'ল ‘পার্কল ভবন’, মায়ের নামে বাড়ীর নাম। আবার পক্ষ থেকে মায়ের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। অন্যান্য যেসব উৎস থেকে সামান্য টাকা পয়সার সংস্থান হতে পারে সেসব উৎসগুলোতে খোঝখবর নেয়া শুরু করলেন আমার মা। বাড়ী তোলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রস্তুতিমূলক সব দায়িত্ব মাকেই পালন করতে হয়েছিল। এখন শুধু ব্যাংক থেকে টাকা তোলার অপেক্ষা। আবার নির্ধারিত দিনে সাগরদীর সোনালী ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গেলেন ঠিকই, কিন্তু টাকা নিয়ে তিনি আর ফিরতে পারেননি। তিনি ফিরেছিলেন শূন্য হাতে। আবার শূন্য হাতে বাড়ী ফেরার ঘটনাটি ঠিক যেন সিনেমার কোন কাহিনীর মত। ব্যাংক থেকে ফেরার পথে সাগরদীর এক প্রভাবশালী ঠিকাদার তার আসন্ন বিপদের মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়ে আবাকে মানসিকভাবে ঘায়েল করে আবার কাছে ব্যাংক থেকে তোলা পুরো টাকা ধার চেয়ে বসেন। আমার সহজ সরল আবার তার নিজের বাড়ী তোলার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে পুরো টাকাটাই ঐ ঠিকাদারকে ধার হিসেবে দিয়ে শূন্য হাতে বাড়ী ফেরেন। এ ঘটনা বিনা মেঘে ব্রজপাতের মতই সবাইকে শক্তি করে দিল। এ ঠিকাদারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আবার তেমন পরিষ্কার ধারণা না থাকলেও আমার ভাইয়েরা তাকে এলাকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে চিনতেন। এ টাকা ফেরত পাওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠল সকলের কাছে। সবার ধারণা একশত ভাগ সত্যিও হ'ল। এ কর্মফলের মাণ্ডল দিতে হয়েছিল প্রায় কয়েক বৎসর ধরে। সেই ঠিকাদার আর নগদ টাকা ফেরত দেয়নি। দালানের ইটের সাপ্লাই দিয়ে তিনি ধার পরিশোধ করেছিলেন। তার ইটের সাপ্লাইয়ের উপরে আমাদের বাড়ীর কাজ বন্ধ রাখা বা শুরু করার বিষয়গুলো নির্ভর করত। এভাবে বাড়ীর কাজ মাত্র অর্ধেকটা করা সম্ভব হয়েছিল। সেসব দিনের মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাবার সময়গুলো মনে হয় সেদিনের ঘটনা। এখনো সেসব কষ্টগুলো ভোলা সম্ভব হয়নি। প্রায় প্রতিদিন নিজেদের টাকার জন্য সেই ঠিকাদারের কাছে ধরণা দেয়ার স্মৃতির দংশন যেন শত আনন্দের মধ্যেও কষ্টের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এমন সরলতার উদাহরণ আবার জীবনে অগণিত। এভাবে ধার দেনা দেয়া ছিল আবার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধার দেয়া টাকা আর কখনোই ফেরত পাওয়া যাবে না এ সত্য জেনেও আবার ধার দেয়া থেকে কখনো বিরত থাকেননি। বাড়ীর অসমাঞ্ছ কাজ সমাঞ্ছ করার জন্য আর কোন উৎস থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। তাই আমাদের অস্থায়ী ঘরটিতে বসে বসে সামনের জানালা থেকে দেখতাম একটু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা অসমাঞ্ছ পাকা

দালানের কাজ। কবে সে কাজ শেষ হবে আর কবে থাকব সে ঘরে সে স্পন্দনে দেখে দেখে দিন কাটছিল। এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের কোন আশা নেই ভেবেই আমরা বর্তমানকে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মাকে কখনো একেবারে নিরাশ হতে দেখিনি। নিজে ভিতরে ভিতরে নিরাশায় ভুগলেও তা প্রকাশ পায়নি আমাদের সামনে। এমন কি তিনি সম্ভবত নানাবাড়ী থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক এ সময় হঠাতে করে ভাইয়ার দেশে বেড়াতে আসার সংবাদে মা কিছুটা বিচলিত বোধ করতে থাকলেন। কারণ অর্ধনির্মিত এ বাসায় বিদেশে থাকা বড় ছেলের অবস্থান কষ্টকর হবে এ চিন্তায় মা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ভাইয়া কাজী পাড়ায় পার্কে ভবনে আসার পর মায়ের ধারণা পাল্টে গেল। ভাইয়া আমাদের সবার কষ্ট দেখে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজেছিলেন। অসমাপ্ত দালানের কাজটি শেষ করেই ছাড়বেন এমন মনোবল নিয়ে সেজভাইয়ার সাথে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর তৈরী হল দালানের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার শর্টকাট বাজেট। সে বাজেটের পুরো অর্থটাই ভাইয়া বহন করলেন। মনে পড়ে ভাইয়া নিজের হাতেও কিছু কিছু কাজ করে আমাদের প্রতি এবং আমাদের অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি তার আনন্দিকতার প্রমাণ রেখেছিলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মক্ষ্মাতে তার নিজস্ব লাইফ স্টাইলের বর্ণনা শুনে আমরাও যে কম বেশী পুলকিত হইনি সে দেখাটি দেখার জন্য এমন নয়। সমাজতাত্ত্বিক দেশের ধনী গরীবের কোন শ্রেণীবিন্যাস নেই এ কথা আবার কাছে বহুবার শুনেছি। সেই একই কথা আরো হৃদয়ঙ্গম হ'ল ভাইয়ার বর্ণনায়। ভাইয়ার দেশে থাকার সে দিনগুলো শেষ হয়ে গেল। জীবনে এমন দুর্লভ খুশীর মুহূর্ত বোধ করি বার বার আসে না। পরিবারের এ সংকটকালে বড় ছেলের দায়িত্ব পালনের এমন নজির আবক্ষা আমাকে নিঃসন্দেহে বিমুক্ত করেছিল। এতদিনে পরিবারের একটি বড় ধরনের সংকট কাটিয়ে ওঠার আনন্দে এবং সেই সাথে নিজের জীবনের শূন্য খাতাটি প্রকৃতপক্ষে শূন্য নয় বরং সন্তানদের অগাধ ভালবাসায় পরিপূর্ণ এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেন আব্বা কবিতার আবৃত্তির মাধ্যমে-

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী  
তয় নাই ওরে তয় নাই  
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান  
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

তাঁদের জীবনের লালিত স্বপ্নগুলো বিফলে যায়নি। ছেলে মেয়েদের শৈশব আর কৈশোরের দিনগুলোতে তাদের আগলে রেখেছেন পরম সাবধানতায়। তাদের সঠিক বিকাশের জন্য তৈরী করা হয়েছে উপযুক্ত পরিবেশের, পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি জীবনমূর্যী শিক্ষায় আগ্রহী করতে আবার চেষ্টার ক্রটি ছিল না। শৈশব আর কৈশোরের দিনগুলোতে এমন সুদৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়েছিল বলেই সন্তানেরা বুদ্ধিমত্তার সাথে অতিক্রম করেছে চলার পথের বাধা বিপত্তি। আবার যৌবনের সোনালী দিনগুলোতে সন্তানদের স্বাধীন চিন্তা ভাবনাকে ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তাঁরা। সন্তানদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কঠোর কোন বাধা নিষেধের বলয় তৈরী করা হয়নি। সন্তানদের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে চেতনাসমৃদ্ধ করেছিলেন। সন্তানদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলায় আবার আম্মা নিজেদের নিঃশেষ করেছিলেন। নিঃশেষিত জীবনের প্রাণিকে এসে মা-ই স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে যোগসূত্র তৈরী করে জীবনকে অর্থময় করে তুলেছিলেন আর আবারকে তাঁর স্বপ্নের জগতে বসবাসের অকৃপণ সময় দিয়ে তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

পরিবারে ভারসাম্য রক্ষাকারী হিসেবে মায়ের স্বীকৃতি মিললেও নিজের মেয়েদের কিছু ক্ষেত্রে অস্তত তিনি সীমাবদ্ধ মা-হয়েই থাকলেন। মেয়েদের বড় হয়ে ওঠার সময়গুলোতে পাড়া-প্রতিবেশীর চোখে তাঁদের ভাল আর মন্দের বিচার বিশ্লেষণে মা ছিলেন সুক্ষ এবং তীক্ষ্ণ। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার বিষয়ে মায়ের আগ্রহের অভাব না থাকলেও তাদের নির্ধারিত বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়াই বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং মঙ্গলজনক এ বিশ্বাস থেকে মাকে এক বিন্দুও নড়ানো যায়নি। তাই বড় দুই মেয়ের বিয়ের বয়স হবার আগেই শুরু হয়ে যায় বর খোজার তৎপরতা। মায়ের নিজের বেশী বয়সে বিয়ের কারণে এক ধরনের ভীতি তাঁর মধ্যে থেকে থাকতে পারে। তাছাড়া যদ্য দুই মেয়ের হঠাত করে লম্বা আর বড় হবার বিষয়টি সকলের নজরেও আসতে শুরু করায় মায়ের সতর্কতা নতুন মাত্রা পেতে থাকে। চার মেয়ের বিয়ের ব্যয়ভারটি একটি আলগা চাপের মত তাঁর মন্তিকে স্থান করে নিয়েছিল। আবার একই সময়ে হঠাত করে আবার যৌতুক বিরোধী প্রচারাভিযানে যোগ দেয়ায় মায়ের কাছে সব কিছু বেশ গোলমেলে মনে হতে লাগল। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'ল মা যতই মেয়েদের বিয়ের তদ্বির জোরেসোরে শুরু করেন ততই অপছন্দের পাত্র নিয়ে ঘটকরা আমাদের বাসায় আসা যাওয়া বাড়িয়ে দেয়। ঘটকদের কেউ কেউ আবার রাত্রিযাপনসহ ভাল ভাল খাবারের ফরমায়েশও দিতে থাকেন। পরে অবশ্য আমার মায়ের সংবিধ

ফিরে এলে বিয়ের ব্যাপারে তাঁর বেপরোয়া আগ্রহ এবং গতিধারায় ভাটা পড়তে শুরু করে। পরে যখন বিনা চেষ্টা তদ্বিরে আর বলতে গেলে বড় ধরনের ব্যয় নির্বাহ অর্থাৎ ঘোতুক ছাড়াই মেয়েদের সুপাত্রে বিয়ে হয়ে যায় তখন মায়ের সেসব দিনের খন্দ খন্দ ঘটনাগুলো সন্তানদের কাছে হাসি তামাশার খোরাক হয়ে থেকে গেল। সুযোগ পেলেই আমরা মাকে এসব নিয়ে ক্ষেপাতাম।

বাগানে ফুটে থাকা ফুলের মত সময়গুলো ঝরে পড়ে জীবনের বাগান থেকে। মায়ের জীবনে সন্তানদের বড় হয়ে ওঠার পর্যায়গুলোও পরিণতির দিকে এগুতে থাকে। একটা সময় ছিল যখন মা তার সন্তানদের বড় হয়ে ওঠার অপেক্ষায় দিন গুলতেন। সেই সব সময় অতিক্রান্ত হয়ে সন্তানরা যখন বড় হয়ে চলে যায় কর্মক্ষেত্রে, চলে যায় আরো বৃহত্তর পরিমত্তলে তখন সন্তানদের কাছে পাবার জন্য মন্ত্রণালয় কেমন যেন অভিলাষী হয়ে উঠে। ত্বর্ষার্ত মন পথ চেয়ে বসে থাকে কখন কোন সন্তানের সময় হবে পারল ভবনে তাঁর কাছে কিছু সময় জিগিয়ে নিতে। জীবনের গতিপ্রবাহ অপ্রতিরোধ্য। আমার মায়ের সাধ্য কি সেই গতিময়তাকে আটকে দেয়! এরই মধ্যে ছোট ছেলে সেকেন্ড লেফট্যানেন্ট পদে যোগদান করেন। তার চাকুরীতে প্রবেশের ফলে অভিভাবক, ভাইবোন এবং আঞ্চীয়স্বজনের চেহারায় পরিত্বিত ছাপ দেখা গেল। সোনাভাই এর সেনাবাহিনীর চাকুরীকালে তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর ও গাজীপুরের মেশিন টুলস ফ্যান্টোরে কর্মরত ছিলেন। তার সর্বশেষ কর্মসূল ছিল বিডিআর সদর দপ্তর ঢাকায়। চাকুরীর মেয়াদ এক বৎসর হতে না হতেই ছোট ছেলে তার বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন মায়ের কাছে। আমার মা এ ধরনের একটি প্রস্তাব আসতে পারে এমন সন্তানবানার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কারণ বরিশাল মেডিক্যালে তিনমাস ক্লাস করার পর তাঁর যে ছেলেটি চাকুরীর জন্য মরিয়া হয়ে মায়ের অমতে সেনাবাহিনীতে চলে যাবার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই ছেলের চাকুরীতে যোগদানের ছটফটানীর কারণ একজন সুদক্ষ মা বোবেন বৈকি। সন্তানের অন্তর্যামী হয়ে মা-ই তাদের আগাম ইচ্ছা অনিচ্ছা আর ভাল মন্দের বিষয়গুলো বুঝতে পারতেন। পরে জানা যায় সোনাভাই বরিশালের একটি ব্যবসায়ী পরিবারের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং ঐ পরিবারের ছোট মেয়ে ‘মুনমুন’ এর সাথে তার ঘনিষ্ঠতার কথাও কারো জানতে বাকী থাকে না। আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে এ বিয়ের বিপক্ষে জোরালো যুক্তির মধ্যে বড় দুই ভাইয়ের লেখাপড়া তখনও শেষ হয়নি এবং তারা অবিবাহিত। মাথার উপর চার মেয়ের বিয়ের সুব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়গুলো ছোট ছেলেকে বুবানোর

চেষ্টা করা হলেও সে মুহূর্তে তা বোঝার মত ক্ষমতা তার ছিল না। অনেকটা মুহূর্মান এবং অকুণ্ঠিতভেই তিনি বিয়ের প্রস্তাবটিতে সায় পাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। ছোট ছেলেটি এত অল্প বয়সে বিয়ের জন্য ততটা পরিপক্ষ হয়নি এবং সামাজিক ও পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিয়ের প্রস্তাব যথাযথ না হলেও শান্তিপ্রিয় আৰু আম্মা এ বিয়েতে হাঁ বোধক মতামত দিয়েছিলেন। ছেলের ইচ্ছা ও অবস্থান সম্পর্কে আৰু আম্মা যথার্থই উপলক্ষ্মি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশেষে ছোট ছেলের বিয়ের তাৰিখ নির্ধারিত হয় ১৩ই মে, ১৯৮১ সনে। বিয়ের পর ছোটছেলে শামসুল আজম সংসারের মূল কেন্দ্ৰবিন্দু থেকে ধীরে ধীরে দূৰে সৱে যেতে থাকেন। তার নিজস্ব ভূবনের আনন্দ, ভাল লাগা, না লাগা গুলোৱা সাথেই তিনি মগ্ন হয়ে রইলেন বেশ কয়েক বৎসর। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট থাকা অবস্থায় তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিছী লাভ কৱেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে ১৯৮০-৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মইনুল রোডের বাসায় বসবাস কৱিছিলেন।

বৎসর গড়িয়ে চলল কাজীপাড়াৰ বাসায়। কাজীদেৱ জমি কিনে আৰু বাসায় আৱো কয়েকজন সরকারী কৰ্মকৰ্তা কাজীপাড়ায় বসতি স্থাপন কৱেছিলেন। কাজীদেৱ মধ্যে আলতাফ কাজীৰ সাথে কাজীপাড়াৰ সবার মোটামুটি একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি বিভিন্ন আচার, অনুষ্ঠান, সালিশী, ধৰ্মীয় কাজে প্রতিবেশীদেৱ সম্পৃক্ত কৱতে আগ্রহী ছিলেন। আৰু যারা বাইৱে থেকে এসে কাজীপাড়াৰ বাসিন্দা হয়েছেন তাৰাও একেঅপৱেৱে অবিচেছেদ্য অংশে পৱিণ্ঠ হয়ে যেতে থাকে। কোন প্রতিবেশীৰ বাসায় নতুন টেলিভিশন এলে তাৰ দৰ্শক হয়ে যায় অন্য পৱিবাৰগুলো। আৰু টেলিফোন ব্যবহাৰেৱ বেলায়ও একই নিয়ম। এভাবে প্রতিবেশীৰাও আত্মীয় স্বজনেৱ মত আপনজন হয়ে উঠতে থাকে। আমাৰ মায়েৱও এৱেকম আপনজনেৱ তালিকায় ছিলেন তুহিনেৱ মা, নীৱৰ্ম মা যাদেৱ আমোৰা খালাম্বা বলে সমোধন কৱতাম। সংসারেৱ সব ঝামেলা গুছিয়ে জ্যোৎস্না রাতে খালাম্বাৰা যখন সবাই একসাথে উঠোনে বসে গল্প কৱতেন তখন পিছনে পড়ে থাকত জগতেৱ সকল সমস্যা, দুঃখ কষ্টেৱ জঞ্জলগুলো। বিশেষ কৱে তুহিনেৱ মায়েৱ আগমনে সব সময়ই আসৱ জমজমাট হয়ে উঠত। তিনি একাই আসৱ মাতিয়ে রাখতেন। এসব আলোচনায় সংসারেৱ খুঁটিনাটি বিষয়াদি থেকে শুৱ কৱে মহিলাদেৱ একান্ত সুখ দুঃখেৱ বিষয়াদি বাদ যেত না। এ ধৰনেৱ আসৱ ছিল তাদেৱ মনেৱ অপ্রকাশিত সুখ

দুঃখের নির্গমন পথ। গল্পগুজবের সাথে চায়ের পর্ব শেষে চলত পানসুপারী খাওয়ার পর্ব। সব শেষে ঠোট লাল করে যখন যে যার বাসার দিকে রওনা হতেন তখন মনে হত স্বল্পকালীন এ ঘরোয়া সময়টি যেন দীর্ঘ আনন্দময় সময়ের চেয়েও বেশী মূল্যবান। সেই তুহিনের মা, নীরুর মা এখনো মায়ের অকৃত্রিম সঙ্গী। সবাই আজ বয়সের ভাবে ন্যূজিদেহ। বরিশাল গেলে আজও মা অনুরোধ করেন তাঁর প্রিয় সঙ্গীদের খোঝখবর নেবার জন্য। সময় বড় নিষ্ঠুর, বয়স বাড়িয়ে দিয়ে রোগাক্রান্ত করে সবাইকে। দুর্বল করে দেয় তুহিনের মায়ের অজস্র কথামালার দাপটকেও। এভাবেই মায়ের জীবনে আশির দশকের বিম ধরা সময়গুলো বিকশিত হতে থাকে। এসময়ে আমাদের মা যেন অনেক বেশী পরিপক্ষ হয়ে উঠতে থাকেন তাঁর ভাবজগতে। জীবনের ভালমন্দ মুহূর্তগুলো নিয়ে নিরবধি চলতে থাকে সময়, অজানা সময়ের পথে।

সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর আবীরা আমাদের থাম থেকে বেশ কিছু দূরে নলদোয়ানীতে একটি বেসরকারী স্কুলের প্রধান হিসেবে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থা এতই অবদ্বীপ্য খারাপ ছিল যে, সে চাকুরীটি আবীরা করতে পারেননি। চাকুরী না করলেও অবসর জীবনে আবীরাকে কখনোই অবসরে দেখিনি। তিনি সদাসর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন। প্রায় সারারাত লেখালেখির কাজে রাত জেগে থাকা আবীরার বহুদিনের অভ্যাস। খুব সকালে আবীরাকে দেখা যেত ফুলবাগান আর উঠোন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যস্ত। উঠোনে পড়ে থাকা এক টুকরো কাগজও তাঁর সৌন্দর্যবোধকে কষ্ট দিত। সমস্ত পরিবেশটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না পাওয়া গেলে আবীরার হৈচে এর শব্দে প্রতিবেশীরাও সজাগ হয়ে পড়ত। আবীরার ব্যস্ততার জগতে সমাজের দুঃখী মানুষের আসা যাওয়ার পথ ছিল অবারিত। আবীরার সমাজ দরদের স্টাইলটি ছিল ভিন্ন রকমের। তিনি সরাসরি মানুষকে বোঝাতে চাইতেন সমাজের অসংগতির কথা। বাসায় আগত মেহমান অথবা পাড়ার তরঙ্গ ছেলে মেয়েদের তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে আবীরার নিরলস প্রচেষ্টা ছিল সত্যিই অতুলনীয়। এমন কি তাঁর বক্তৃতার হাত থেকে ভিক্ষুকও রেহাই পেত না। আবীরার এ ধরনের সমাজসেবামূলক কাজের জন্য তিনি অন্তরের ভিতর থেকে তাগিদ অনুভব করতেন বলেই এসব কাজে তাঁকে বাধা দেবার সাহস কারো ছিল না। দেশের সব কয়টি জাতীয় দিবস পালনের জন্য খুব ভোরে পারম্পরাগত ভবনের সামনে উড়িয়ে দেয়া হত জাতীয় পতাকা এবং এ অনুষ্ঠানে সমবেত হত পাড়ার ছোট বড় আঘাতী ছেলেমেয়েরা। আবীরা তাঁর স্বভাবসূলভ

বক্তৃতা আর কথাবার্তা দিয়ে সবাইকে এসব দিনের ইতিহাস শোনাতেন। ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনামূলক কথাবার্তা বলে অনুষ্ঠানগুলোকে আকর্ষণীয় করে তুলতেন আববা। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে একুশে ফেন্স্ট্র্যারী দিনটি উদ্বাপন ছিল ব্যক্তিক্রমধর্মী। এ দিনে বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় গাছের পাতায় তিনি মুক্তাঙ্গের আঁকতেন বাংলা বর্ণমালার ক,খ,গ-----। পথচারীরা পর্যন্ত এসব অঙ্করগুলো দেখে একুশে ফেন্স্ট্র্যারীর চেতনায় উত্তৃক্ষ হতেন। বরিশালের স্থানীয় সংবাদপত্রে একবার এই ব্যক্তিক্রমধর্মী উদ্যেগের সংবাদ ছাপা হয়েছিল যার শিরোনাম ছিল "এক নিভৃতচারীর কথা"। পারুল ভবনের সামনে উদ্বাপিত সেসব দিনগুলো আজ আর কারো মনে পড়ে না। এসব দিনগুলো উদ্বাপনের জন্য সংসারের হাজার কাজের মধ্যে মাকেও অভিনিষ্ঠ কাজের দাঁড়ি নিতে হত। এতে যা-ও মাঝে মধ্যে বিরক্ত হতেন না এমন নয়। কিন্তু আজ এতকাল পরে যা সেসব দিনগুলোর অভাব অনুভব করেন। সেসব দিনের উচ্ছলতা আর প্রাণবন্ধ কলরব খোনার জন্য আজ মায়ের প্রাণ আনচান করে ওঠে। আজ আর কারো সময় হয়ে ওঠে না পারুল ভবনের সামনে একত্রিত হয়ে দেশের গান গেয়ে দেশকে ভালবাসার নজির রেখে যেতে নতুন প্রজন্মের কাছে। সময় বেল সব কিছু বদলে দেয়। নতুন যোড়কে নতুনভাবে জীবন সাজায় যে -তার নাম সময়। আমার যা সময়ের কাছে পরাজিত হতে চান না। বর্তমানে পারুল ভবনে বসবাসরত সেজ ছেলেকে যা এখনো উৎসাহিত করেন আববার অসীম ভালবাসায় উদ্বাপিত এসব অনুষ্ঠান পালনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য। নাত্নীকেও তিনি গাল্লে গাল্লে পারুল ভবনের এসব সাংস্কৃতিক গতিধারা অনুসরণ করতে উস্কে দেন। পঁচাত্তর বয়স উক্তীর্ণ এয়ন সচেতন দেশপ্রেমিক যিনি-তিনিই আমাদের যা।

আমার মায়ের আট সন্তানের মধ্যে পঞ্চম স্থানে আমাদের দুই বয়স বোনের অবস্থান। পর পর চার ভাইয়ের জন্ম লাভের পর একই সাথে দুই বয়স মেয়ের পৃথিবীতে আমার ক্ষণটি ছিল মায়ের জীবনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সময়। বলতে গেলে বাঁচা অরার সঞ্চিকণে আমরা দুই বোন পৃথিবীর আলো বাতাসে প্রথম নিঃশ্বাস লিয়েছিলাম। গর্ভকালীন সময়ে মায়ের কষ্টের কথা পরবর্তীতে আববার কাছে জেনেছি। কোন এক নার্স মায়ের বেঁচে থাকার কোন সন্তাননা নেই ভেবে মাকে মুহূর্ষ অবস্থায় ফেলে চলে গিয়েছিলেন। পরে আববার পটুয়াখালীতে চাকুরীরত অবস্থায় সেই নার্সের সাথে দেখা হলে তিনি বিস্ময়ভরে আমাদের দুবোনকে দেখেছিলেন। আববার মুখে আরো জেনেছিলাম জন্মের পর আমাদের

গায়ের চামড়া রসুনের খোসার মত পাতলা আবরণে আবৃত ছিল। অনেক কষ্টের বিনিময়ে মা পেলেন আমাদের আর আমরা পেলাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মাকে। আমাদের পেলেন বলেই তিনি আরো পেলেন শরীরব্যক্তির অসুস্থতা। মায়ের হৃদযন্ত্রটা অসুখে পড়েছিল আমাদের জন্মের পর থেকেই। আমাদের জন্মই মায়ের হৃদযন্ত্রের অসুস্থতার কারণ হয়ে থাকল। ছোটবেলা থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত কারণে অকারণে মাকে কত শত কষ্ট আর জ্বালাতন করেছি তার ইয়ত্তা নেই। আজ নিজেদের মা হ্বার মধ্য থেকে সে সব কষ্টের কষ্ট অনুভব করি। এইচ, এস, সি পাশের পর দুই বোনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবার বায়নাটি ছিল মায়ের জন্য একটি বিপদের অশনি সংকেত। বাঙ্গবী মুন্মুন, নীলা আর অপু পড়তে যাচ্ছে ঢাকায়। কাজেই আমরাও ঢাকা পড়ব-এমন আদ্দার বাসার সবাইকে হতভম্ব করে দিল। একদিকে আবৰা সবেমাত্র অবসরে যাবার কারণে আর্থিক দৈন্য আর অন্যদিকে আমাদের মত দুটি বোন যারা জগত সংসারের কুটিলতা আর জটিলতা সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান রাখে না, এক মুহূর্তে বিশ্বাস করে ফেলে শত্রুকেও, অঙ্গ আবেগ দিয়ে যারা বুরতে চায় পরিবেশ পরিস্থিতি - তাদের কি করে পড়াশুনার জন্য সুন্দর ঢাকা পাঠানো যায় - সে চিন্তায় মায়ের ঘুঘ হারায় হয়ে গেল। মা ছেলেদের পড়াশুনার জন্য দূরে পাঠাতে হাজার আপত্তি তুলতেন তিনি কি করে আদরের দুই বড় মেয়েকে ঢাকা পাঠাবেন পড়াশুনার জন্য? মেয়েদের এ ধরনের প্রস্তাৱ মায়ের জন্য যেন মঙ্গল থেকে বসতি করার মতই অবাস্তব ছিল। মেয়েদের এ প্রস্তাৱে আবৰা ভূমিকা কি হতে পারে তা নিয়ে চিন্তাভাবনায় মা আরো নাৰ্ভাস হয়ে পড়েন। আবৰা বৰাবৰের মতই মেয়েদের পক্ষ অবলম্বন কৱলেন, যেখানে অর্থ বা অন্য কোন বাঁধাই টিকে থাকতে পারল না। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে আবৰা আর আমরা দুইবোন মিলে বৰাবৰের মত একটি পক্ষ হয়ে গেলাম। আর বাকী সবাই অন্য পক্ষে। অন্য পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থানকাৰীদের সবাইকে হতাশ করে আবৰা আমাদের নিয়ে ঢাকা অভিযুক্ত রওনা হলেন ১৯৮১ সনে। অবশেষে আবৰার সাথে আমরা দুইবোন ঢাকা এলাম এবং দীর্ঘদিন ধৰে যে মামাদের সাথে আমাদের নামমাত্র যোগাযোগ ছিল সেই কবীর মামার বাসায় উঠলাম আমরা। তার বিদেশী কায়দায় সজ্জিত বনানীৰ বাসায় নিজেদের বেমানান মনে হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত ঝামেলা মিটাতে প্রায় পনের দিনের মত তার বাসায় থাকতে হয়েছিল আমাদের। ঢাকা আসার সুবাদে আবু মামা আর কবীর মামার সাথে আমাদের যোগাযোগ হলেও তা ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী এবং এ যোগাযোগের মধ্যে কোন অন্তরের টান ছিল না। এ যেন প্ৰয়োজনের তাগিদে

একত্রফাভাবে তাদের কিছুদিন ঝামেলায় ফেলার মত ব্যাপার। বিশেষ করে ছোট মামার বাসায় থাকা অবস্থায় ছোটখাট বিষয়ে ছোট মামার সাথে মামীর মতপার্থক্য আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা অবস্থায় কখনো বনানীতে বেড়াতে যাওয়া হয়নি। মনের ভিতর থেকে তেমন তাগিদও আসেনি। মামারাও শত ব্যন্ততার কারণে আমাদের খোঁজ খবর নিতে পারেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রথম দিকের দিনগুলি ছিল আবার জন্য খুব কষ্টে। শুধুমাত্র মেয়েদের ইচ্ছাপূরণের জন্য আবার এত কষ্ট স্বীকার করেছেন। বনানী থেকে প্রতিদিন খুব ভোরে বেবী ট্যাঙ্কিতে করে আবার সাথে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকল্যাণ বিভাগে আসতাম। যতক্ষণ ক্লাস চলতো ততক্ষণ আবা অপেক্ষা করতেন আমাদের জন্য। সারাদিন মেয়েদের জন্য আবার এ অপেক্ষা করার বিষয়টি সবাইকে অবাক করত। আমাদের জন্য আবার এ অসীম কষ্টের স্মৃতিচারণে মন আজও বিদীর্ঘ হয়। মনে পড়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে অভিভাবক হিসেবে আবার বক্তৃতা আমাদের শিক্ষকদেরও অভিভূত করেছিল। হলে সিট না পাওয়া পর্যন্ত আবা আমাদের সাথে ঢাকা রয়ে গেলেন। তবে মামার বাসা থেকে আমরা গোরান আবার ভাই মোস্তফা আলী আখন্দ অর্থাৎ আমাদের ডাক্তার চাচার বাসায় এলাম। ডাক্তার চাচা তখন বাংলাদেশ বিমানে চাকুরী করতেন। আমাদের এই চাচা ছিলেন সুদর্শন পুরুষ। পার্কিংস রোগে দীর্ঘদিন কষ্ট পাবার পর তিনি সম্ভবত ১৯৮৪ সনে ইন্টেকাল করেন। ব্যয়বহুল চিকিৎসায় তার সঞ্চিত অর্থ সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়। চাচার অকাল মৃত্যুতে পরিবারটি হৃষ্টাং অঁথে সাগরে পড়ে যায়। তখন এ অসহায় পরিবারটিকে আবা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন। আবা এই চাচার ছেলে মঞ্জুরকে বরিশালের বাসায় নিয়ে আসেন এবং মঞ্জুর আমাদের বাসায় থেকেই পড়াশুনা শেষ করে। বর্তমানে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের একজন সদস্য হিসেবে বরগুনা কলেজের সহকারী প্রভাষক হিসেবে চাকুরী করছেন। এই চাচার বাসায় আরো কিছুদিন থাকার পর শামসুন্নাহার হলের বর্ধিতাংশে আমাদের সীট বরাদ্দ হলে আবা বিষণ্ণ মনে বরিশাল ফিরে এলেন। আবার বরিশাল চলে আসার ক্ষণটি যেন এখনো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই।

পারং ভবনের চাঁদের হাটে আন্তে ধীরে নামতে থাকে নীরবতা। মায়ের কাছে থেকে গেল রুক্ষী আর বেবী-আমাদের দুই ছোটবোন। অন্য ছয় ভাইবোন যেন মার্বেলের গুটির মতই ছাড়িয়ে পড়ল তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে। চাচাতো ভাই বাদশাও চাকুরীর খোঁজে ব্যন্ত হয়ে পড়ল। মেজভাইয়ার ইন্টার্নশীপ শেষ হবার

পর পরই তাকে সরকারী ডাক্তার হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য যেতে হ'ল বামনা, পটুয়াখালীর এক প্রত্যন্ত গ্রামে, যেখানে সন্ধ্যাবেলায়ই নেমে আসে রাতের নিষ্ঠকৃতা। শেয়ালের চিংকারে দীর্ঘ অবস্থা রাতগুলো জগদ্দল পাথরের মত বুকে চেপে বসত। রাতের নির্জনতার ছোবল হয়ে ওঠে আরো ভয়াবহ। এমনই এক পরিবেশে দিনের পর দিন সময় কাটানো হয়ে ওঠে অর্থহীন। কিন্তু উপায় ছিল না বলেই অসহনীয়ভাবে বামনার দিনগুলো শুধু পার করে দেবার কষ্ট মেনে নিয়েছিলেন মেজভাইয়া। শেষমেষ একটা যুতসই উপায় তিনি ঠিকই বের করেছিলেন। কিন্তু তার সেই উপায়টা শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছিল আমাদের দিকে। সে এক অন্য গন্ত। সে গন্নের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আমাদের সেজ বোন ঝুঁকী পারভীন। মেজভাইয়ার বামনা থেকে নিষ্কৃতি মিলল। তিনি পেয়ে গেলেন ইরানের একটি হাসপাতালে চাকুরীর সুযোগ। সরকারী ডাক্তারের তালিকা থেকে তার নামের অস্তিত্ব এভাবেই ঘূর্ছে গিয়েছিল। তখনকার দিনে ইরানে ডাক্তার হিসেবে চাকুরীতে যাবার সুযোগ ছিল একটি ফাটাফাটি ব্যাপার। কাজেই মেজভাইয়ার ইরান যাবার খবরে সবাই যখন আনন্দে দীপ্তোজ্জ্বল তখন মা ছিলেন অশ্বাভাবিক চুপচাপ, অবিচল। বড় ছেলের শূন্যতার শোকভার না মিলাতেই মেজ ছেলের সুদূর ইরানে যাবার প্রস্তাব মায়ের জন্য ছিল কঠিন। কিন্তু মনের অনুভূতির প্রকাশ ছিল তখন বেমানান। সময় বড় দামী। সময়ের কাজ সময় থাকতেই করতে হয়। তাই মাকেও মেনে নিতে হয় মেজ ছেলের ইরান যাবার সব আয়োজন। শেষ পর্যন্ত ১৯৮২ সালে বিদায় দিলেন মেজ ছেলেকে। সেজ ছেলে তখন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলো দেখার কৌতুহলে চরকীর মত ঘূরছেন বিভিন্ন জেলায়। সোনাভাই ও ভাবী দু'জনেই তখন নতুন সংসারের অগ্রিয় সুধায় আত্মহারা। এ রকম একটি চলিষ্ঠ সময়ে মা প্রথমবারের মত দাদী হলেন এবং ছেট ছেলে হ'ল প্রথম সন্তানের গর্বিত পিতা। ছেলের নাম তারিক বিন আজম, তানিম। তানিমের জন্ম ২২শে মার্চ, ১৯৮৩।

পাঁচ.

দুই ভাইয়ের বিয়ের পর মীনার বিয়ের কথাবার্তা এগুতে থাকল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসার মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই হঠাত করে এ বিয়ের ঘটনা ঘটে। ভাইয়ার বন্ধু হিসেবে পাত্র আবদুল মালেক আমাদের পরিবারের পূর্ব পরিচিত হলেও বিয়ের পাত্র হিসেবে কথনোই তাকে ভাবা হয়নি। তিনিও

মক্ষের প্যাট্রিস লুবুষা গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম,এ ডিগ্রী লাভ করে মাত্র স্বদেশে ফিরে এসেছেন। দেশে ফেরার আগে ভাইয়া তার বন্ধুকে অনুরোধ করেছিলেন শামসুল্লাহার হলে থাকা আমাদের দুই বোনের খোঁজ খবর নিতে। আর সেই খোঁজ খবর নিতে গিয়েই তিনি বড় মেয়ে মীনা পারভীনকে পছন্দ করেন এবং ১৯৮১ সনের ২৭শে নভেম্বর পারিবারিক পর্যায়ে তাদের বিয়ে হয়। তবে বিয়ের আগে পাত্র পছন্দের ভোটাভুটিতে পাত্রকে আমার মায়ের একশত ভাগ পছন্দের কারণ ছিল পাত্রের আন্তরিকতা, অক্তিমতা আর প্রাণচাঞ্চল্য। গান বাজনা, আনন্দ উচ্ছলতায় ভরপুর আবদুল মালেক এমন একজন পাত্র যিনি আমাদের মত সংক্ষারমুক্ত পরিবারের জন্য উপযুক্ত, মায়ের এমন অভিমতের কারণেই এ বিয়েতে কারো অমত ছিল না। তবে হঠাতে করে ঘটে যাওয়া এ বিয়েতে মায়ের অন্তর্দৃষ্টি ছিল প্রথম। বিয়ের মাত্র দুই দিনের মধ্যে এ্যাপেনডিক্স অপারেশনের জন্য নতুন বরকে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়েছিল। বিয়ের আনন্দ শেষ হতে না হতে হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি, বর পক্ষের নতুন আঞ্চলিক স্বজনের আতিথেয়তা, পাছে কারো কোন অসন্তোষ সৃষ্টি হবার মত কারণগুলো নিবৃত্ত করা ইত্যাদিতে মায়ের ব্যথাযথ প্রস্তুতি এবং অভিজ্ঞতা না থাকলেও মা সবকিছু মোটামুটিভাবে সামলে নিয়েছিলেন। মায়ের দুই যময়ের একজনের বিবাহিত জীবনের যাত্রা শুরু এবং অন্যজনের একাকিত্বের শুরু। মীনার বিয়ের পর যময দুই মেয়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্যখানে এক অদৃশ্য দেয়াল তৈরী হ'ল। আমার সঙ্গীহীন জীবনকে আনন্দময় রাখার জন্য আবৰা আম্বার অনেক বিনিন্দ্র রাত কেটেছিল। মায়ের জন্য এ ছিল অন্যরকম অভিজ্ঞতা। যময যেয়েদের মা হিসেবে আমার মায়ের জীবনে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার ঘটনাও কম ঘটেনি। এমন সব অভিজ্ঞতার স্বাদ অন্য ক'জন মায়ের ভাগ্যে ঘটে? পারম্পরাগ ভবনের নিত্যদিনের হঠাত উত্তৃত নানান ঝামেলার মধ্যেও বিয়ের সেসব দিনগুলো আজও আলাদা করে ভাবনায় রায়ে গেছে। সেসব দিনের মধ্যুর কথকতার অফুরান স্মৃতিমালা মায়ের মনের গহীনে ভেসে বেড়ায় নিত্যদিন। সেসব দিনের স্মৃতিগুলো হারানো দিনের গানের মতই বার বার ফিরে ফিরে আসে নতুন আবেশে, নতুন নিমগ্নতায়। মধুচন্দ্রিমার আগেই প্রথম বর্ষের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণায় বরিশালের সব আনন্দের লাগাম টেনে পড়াশুনার খাতিরে ঢাকা চলে আসতে হয় আমাদের। ঢাকায় আসার পর থেকে আবৰা আম্বার উৎকর্ষও বেড়ে যেতে থাকল খুব স্বাভাবিক কারণে। ছাত্র রাজনীতি, হরতাল বা অন্য যে কোন অজুহাতে স্বল্প সময়ের নোটিশে হল ত্যাগের ঘটনা সেসব দিনগুলোতে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। হলের

টেলিফোনে যোগাযোগও কঠিন ছিল। মামারা বনানীতে থাকলেও তাদের সাথে যোগাযোগের অভাব ছিল। গোরানে ডাঙ্গার চাচা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকায় তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খোঁজ খবর নেয়ার মতই কেউ ছিল না। তাই চাচার তরফ থেকে আমাদের খোঁজ খবর নেয়ার আশাও আমরা করতাম না। মাঝে মাঝে হল ছাড়ার নির্দেশে তড়িঘড়ি করে কোথাও আশ্রয় নিতে আমরাও অভিযন্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। তবে মীনার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি বদলে গেল অনেকটা। দুই বোনের খোঁজ খবরের দায়িত্ব তখন দুলাভাই এর উপর বর্তাল।

মায়ের জীবনের চড়াই উৎরাইয়ের পথগুলি নিতান্ত কম নয়। ছেলেমেয়েদের কারণে জীবনে কোন অনভিপ্রেত পরিস্থিতির মুখোযুখি না হলেও সেজ ছেলের অবিন্যস্ত জীবনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মায়ের কমপ্লেক্সাইজের ঘটনা ছিল বহু। তিন ছেলের প্রতিষ্ঠিত জীবনের চিত্র মায়ের মনে শক্তি এনে দিলেও সেজ ছেলের জীবনের অনিশ্চয়তা মায়ের জন্য ছিল মনস্তাপের বড় কারণ। অন্যান্য ভাইদের সাথে তার অবস্থার তুলনায় কিংবা পারিপার্শ্বিক আলোচনা বা সমালোচনায়ও কোন ভাবান্তর দেখা যেত না সেজ ছেলের মধ্যে। পিতা পুত্রের মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য ব্যবধান দিন দিন বেড়ে যেতে থাকল। এই অবস্থায় আবরাকে সামলানো ছিল মায়ের জন্য সবচেয়ে শক্ত সমস্যা। সেজ ছেলের উপরে আবরার রোষান্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকলে সেই পরিস্থিতির মোকাবেলায় মাকে পড়তে হয়েছিল উভয় সংকট। এ ধরনের একটি কঠিন সময়ে মা তার সেজ ছেলেটিকে সব ধরনের ঝাড়বাপটা থেকে আগলে রেখেছিলেন। সেজ ছেলের জীবনের সেই অবচেতন অধ্যায়ে তার প্রতি মায়ের ক্রমাগত তদারকির কারণেই পরবর্তীতে একটি অর্থময় জীবনে ঘুরে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করেছিলেন তিনি। দেরীতে হলেও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে পরিবারের অন্য সবার মত জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তিনি ১৯৮০ সনে বদলী হয়ে ঢাকা গেলেন এবং এ সময় তিনি এমএসএস ও এমএড ডিগ্রী অর্জন করলেন। পরবর্তীতে তিনি সহকারী উপজেলা শিক্ষা\_কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেলেন। ১৯৯৬ সনে শ্রেষ্ঠ এ,টি,ই,ও হিসেবে সোনার মেডেল পুরস্কার পেয়ে তিনি সবার ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিয়েছিলেন। সবচেয়ে কাকতালীয় বিষয় হ'ল এই সেজ ছেলেটিই শেষ পর্যন্ত মায়ের পছন্দের শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত রইলেন এবং মায়ের বার্ধক্যের সঙ্গী হয়ে পার্শ্ব ভবনে স্থায়ী হলেন।

সন্তানদের নিজের কাছে রাখার জন্য মায়ের একান্ত চেষ্টা নিষ্কল হতে থাকল। আরো একজনের ঢাকা যাবার সময় ঘনিয়ে এল। সে রুবী পারভীন, আমার মায়ের সেজ মেয়ে। রুবী আগাগোড়াই একটি ঘরোয়া এবং সৌখিন মেয়ে। পড়াশুনার চাইতে ঘরকন্নার কাজকমেই বেশী পটু ছিল। ঘরদোরের শ্রী বৃক্ষিতে, মেহমানদের খেদমতে আর রান্নাবান্নায় তার অসীম আগ্রহের কারণে পড়াশুনায় তার ছিল ব্যাপক গাফিলতি। রুবীকে থায়ই পাওয়া যেতে রান্নাঘরে। তবে রুবীর সার্বক্ষণিক পরিচর্যায় বাসাটি হয়ে উঠত গুলবাগ। এরকম একটি ঘরোয়া মেয়ে যখন যশোর বোর্ডে মেধা তালিকায় মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এইচ,এস,সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল তখন তাকে পড়াশুনার জন্য ঢাকা চলে যেতে দিতে হবে- এমন বাস্তবতা মেনে নিতে আব্বা ও আমার অবস্থা কঠটা কঠিন হয়ে উঠল তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে আব্বার সারাদিনের হাজার ফরমায়েশের যোগানদাতা মেয়েটি চলে যাওয়ার সংবাদে আব্বাও ছিলেন কিছুটা দিশেহারা। কিন্তু বড় দুই মেয়ে আর ছোট ছেলের বাসা ঢাকায় থাকায় রুবীর ঢাকায় পড়াশুনা করার পথ হয়ে গেল মসৃণ। রুবীর চলে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হ'ল বেবী। কারণ রুবী বেবীর বয়সের পার্থক্য চার বৎসর হলেও তারা ছিল একজ্ঞ। রুবীর উপর বেবীর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে রুবীর ঢাকায় চলে আসায় বাসায় বেহাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে- এ বিষয়ে বেবী নিশ্চিত ছিল। বেবীর স্কুলে যাবার ড্রেস ইঞ্জি করে ঠিকঠাক করার দায়িত্বটি রুবী পালন করত। এ নিয়ে দুজনার মধ্যে যথেষ্ট বাকবিতভা থাকা সত্ত্বেও বেবীর সকল রুটিন কাজ রুবীকে করতে হত। বেবীর কাজে ফাঁকি দেবার এরকম দু'একটি ঘটনা সবাইকে এখনো হাসায়। সে রকম একটি ঘটনা বলছি। দিনটি ছিল শুক্ৰবাৰ। শুক্ৰবাৰ ভিক্ষার জন্য সকাল থেকে ভিক্ষুকদের বাসায় আসা যাওয়া চলছিল। সকালে বেবী পড়াশুনায় ব্যস্ত। বেবীর জোরে জোরে পড়ার শব্দ সবাই শুনছিল। এমন সময় ভিক্ষুকের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। ঠিক সেই মুহূৰ্তে বেবীর পড়াশুনার শব্দটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। বেবীর টেবিলের কাছে উঁকি দিয়ে রুবী দেখল বেবী পড়ার টেবিলে গাত্তীর মুম্বে আচ্ছন্ন। তখন ভিক্ষুকের ডাকাডাকিতে রুবী বাধ্য হয়ে ভিক্ষুক বিদায় করে ফেরার সময় বেবীর রুমে উঁকি দিয়ে দেখল বইয়ের পাতায় মুখ লুকিয়ে হাসছে বেবী। এবার আর রুবীর বুৰাতে বাকী রইল না বেবীর হঠাৎ করে ঘুমিয়ে পড়ার কারণটি কি ছিল। রুবী ঢাকা চলে যাবার পর সেই বেবীই পূরণ করল রুবীর স্থান। সে হয়ে গেল পারল্ল ভবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

বড় দুই মেয়ের ঢাকা চলে যাবার মধ্য দিয়ে মেয়েদেরও বরিশালের বাইরে চলে যাবার পথ তৈরী হয়েছিল। মায়ের কাছে মেয়েদের দূরে চলে যাবার অনুভূতি ছিল ভিন্ন রকম। মেয়েদের কলহাস্যে আর চঞ্চল চপলতায় সদা আনন্দময় পার্কল ভবনের প্রতিদিনের সময়গুলো যেন হঠাতে করে বদলে গেল। থেমে গেল মুখরতা, হৈচে আর চায়ের আড়তার বিকেলগুলো। বাসায় মেয়েদের থাকার রুমগুলোর বাতাস ভারী হতে থাকল শূন্যতায়। বাসার টাইটুম্বুর আনন্দঘন মুহূর্তগুলো নীরস মুহূর্তে রূপ নিল। মেয়েদের অভাবে পার্কল ভবনের জৌলুস হারিয়ে যেতে লাগল। মেয়েদের সাথে নিত্যদিনের হাজার কথার দরজা বক হয়ে যাওয়ায় মা মেয়ে উভয়েই আহি আহি অবস্থায় সৃষ্টি হ'ল। এ অবস্থায় আক্বা আস্মা ছেলে মেয়েদের দীর্ঘ ছুটির অপেক্ষায় থাকা ছাড়া আর কোন পথ বাকি রইল না। বলে রাখা ভাল যে, আমরা মেয়েরা মাকে ‘তুমি’ করেই সংবেদন করতাম আর আক্বাকে ‘আপনি’ বলে। ভাইদের ক্ষেত্রে আক্বা আস্মা দুজনেই ‘আপনি’-এর পর্যায়ে ছিল।

এর মধ্যে অনার্স পরীক্ষার আগে হঠাতে করে হল ছাড়ার নির্দেশ এলে অনার্স পরীক্ষা সামনে রেখে আমরা আবার বরিশাল চলে আসি। এবার বরিশাল আসার পর মায়ের আরেকটি সমস্যার সাবলীল সমাধান হয়ে গেল। আমার বিয়ের মধ্যে দিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তার অবসান হল ১৯৮৩ সনের ১৮ই ডিসেম্বর। বর বরিশালের ছেলে, সৌন্দী আরবে চাকুরীরত। বরিশালের নামকরা পরিবারের ছেলে হিসেবে এ বিয়ে চূড়ান্ত হতে সময় লাগেনি। মেজ ছেলের পাঠানো অর্থে জাঁকজমকের সাথেই এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর থেকেই আমরা দু’বোনই মোটামুটিভাবে ঢাকার নাগরিক হয়ে গেলাম। বিয়ের পর পড়াশুনায় বড় দুই মেয়ের ব্যাঘাত সৃষ্টির আশংকা থাকলেও বাস্তবে তা হ'ল না। আমরা পড়াশুনা নির্বিশ্বে চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম। এমন কি অনার্স পরীক্ষা শেষ করে ১৯৮৫ সালে বি,সি,এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যও আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলাম।

১৯৮৭ সনে মেজছেলে ইরান থেকে দেশে ফিরে এলে এ বছরই মানিকগঞ্জের নাজমুন নাহার এলির সাথে ১লা অক্টোবর তার বিয়ে সম্পন্ন হয়। দীর্ঘদিন ইরানে কর্মরত সহকর্মী ডাঙ্গার আজাদ তার ছোট শ্যালিকার জন্য মেজছেলেকে পাত্র হিসেবে নির্বাচন করলে পারিবারিক পর্যায়ে এ বিয়ে সোনাভাইয়ের ক্যান্টনমেন্টের বাসায় সম্পন্ন হয়। মায়ের মেজ ছেলেটি চুপচাপ শান্ত প্রকৃতির হলেও তার প্রতি অতি সহজেই মানুষ আকৃষ্ট হয়ে যেত। এরকম আকৃষ্ট হওয়া

দুই একজনের মধ্যে কাওছার ভাই এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। আমার মায়ের বিচারে তার সন্তানদের বিয়ের বিষয়গুলো ছিল ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। সন্তানদের জীবনে মা ছিলেন একজন শিক্ষক, একজন বন্ধু এবং একজন মা। সন্তানদের ঘোবনের সিদ্ধান্তগুলো গড়ে উঠেছে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত চিহ্ন কিংবা পছন্দ অপছন্দের মাপকাঠিতে। এ ক্ষেত্রে সন্তানদের স্বাধীনতায় অভিভাবক হিসেবে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করা হয়নি। নিজ স্বাধীন চিহ্নের প্রতিফলন ঘটেছে তাদের বিবাহিত জীবনে।

রূবীও ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে পড়াশুনা শুরু করে। রূবীর ব্যাপারে মায়ের অতিরিক্ত সাবধানতা ও সর্তর্কতা ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু তিনি ভাইবোনের ঢাকা থাকার কারণে রূবীর তদারকাতে ঘাটতি হবে না মায়ের এমন যনস্কামনা শেষ পর্যন্ত বিফলে গেল। যদিও রূবী তার সহজ সরল ভাবনাগুলো নিয়ে হল লাইফের নিরেট সময়গুলোতে নিজেকে অভ্যন্তর করতে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল। তথাপি নিঃসঙ্গতা থেকে সে মুক্তি পেল না। রূবীর সেই নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোর অবসান ঘটে ২৫শে নভেম্বর ১৯৮৭ সনে। রূবীর বিয়ে হয়ে যায় আবদুল মুহিতের সাথে। এই প্রথম বরিশাল অঞ্চলের বাইরে সিলেটে রূবীর বিয়ে হয়। রূবী মুহিতের বিয়ের শানে নজুলে মেজভাইয়ার বামনা অবস্থানকালীন নিঃসঙ্গতা কাটাবার সেই উপায়টির প্রসঙ্গ না বলে উপায় নেই। মেজভাইয়া তার একাকিত্ত থেকে মুক্তির জন্য বিচিত্রায় পত্রামিতালীর ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ছিলেন। কিন্তু পত্র মিতালী করার সময় সুযোগ হবার আগেই মেজভাইয়া ইরানে পাড়ি জমান আর পত্র মিতালী চালিয়ে যাবার দায়িত্বটি দিয়ে যান ছোট বোন রূবীকে। সেই পত্রামিতার একজনই হল রূবীর জীবনসঙ্গী আবদুল মুহিত। পরবর্তীতে মুহিত রূবী দুজনেই পড়াশুনা শেষ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুহিত বি,সি,এস পররাষ্ট্র সার্ভিসে যোগ দিয়ে এখন মহাপরিচালকের পদে চাকুরী করছেন আর রূবীও বি,সি,এস শিক্ষা ক্যাডারের সদস্য হিসেবে প্রায় দুই বৎসরের মত বরিশাল হাতেম আলী কলেজে শিক্ষকতা করেছিল। স্বামীর সাথে বিভিন্ন দেশে থাকার কারণে রূবীর পক্ষে চাকরীতে আর লেগে থাকা সম্ভব হয়নি।

সময় স্থির থাকে না। দেখতে দেখতে এ সময়ের মধ্যে মায়ের তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েদের বিয়ে হওয়াই শেষ কথা নয়। বিয়ের পরে তাদের পড়াশুনায় কোন বাধার সৃষ্টি যেমন হয়নি তেমনি লক্ষজ্ঞান প্রয়োগের সুযোগও

তৈরী হয়। আমরা দুই বোন বি,সি,এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী চাকুরীতে যোগদানের সুযোগ লাভ করি। মায়ের জীবনে অনেক কিছু না পাবার আফসোসগুলো বদলে গেল অনেক প্রাণির আনন্দে। আবো যিনি তার সারাজীবনে মেয়েদের জন্য ‘না’ শব্দ ব্যবহার করেননি, তিনি ভুলে গেলেন আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার যুদ্ধে আর্থিক আর মানসিক কঠের সেসব দিনগুলো। হারাধনের দশটি ছেলের হারিয়ে যাওয়া গঞ্জের মত সব ভাইবোন যখন বরিশালের গভি পেরিয়ে দেশবিদেশে ছড়িয়ে গেল, তখন মায়ের একমাত্র সঙ্গী হয়ে রয়ে গেল আমাদের সবচেয়ে কনিষ্ঠ বোন বেবী। বেবী ছিল মায়ের সর্বক্ষণের সাথী। ছায়ার মত মায়ের জীবনে তার লেপটে থাকার বহু ঘটনা মায়ের স্মৃতির মনিকোঠায় এখনো জুলজুল করছে। সেই বেবীও আর বেবী রইল না। সেও ধীরে ধীরে ডানা মেলার সময়ে পৌঁছে গেল। ক্লাশ ফাইভে আর এইটে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে বিজ্ঞান বিভাগে এস,এস,সি এবং এইচ,এস সিতে যখন প্রথম প্রতিক্রিয়া উত্তীর্ণ হল তখন বেবীকে নিয়ে মায়ের ভাবনার অন্ত রইল না। বেবীকে কাছে রাখার উপায় হিসেবে মা তাকে বরিশাল মেডিক্যালে ভর্তির ইচ্ছায় স্থির থাকলেন। আবার ভাইয়ার ইচ্ছে ছিল বেবী ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা আর্কিটেকচার পড়বে। এসব বিষয়ে ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেবার বেলায় আমাদের কোন উদ্যোগ ছিল না। তাই বেবীর ভর্তির ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব না দেয়ার কারণে মেডিক্যালে অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ হারিয়ে গেল। পরে বেবীকে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনসিটিউটের সমাজকল্যাণ বিভাগে অনার্সে ভর্তি করা হল। বেবীর পড়াশুনার বিষয় নির্বাচনে কালবিলাসের কারণে বেবীর ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার না হ্বার কারণ হয়ে থাকল আমাদের সময়মত উদ্যোগ নেবার ব্যর্থতা।

আশির দশকের মধ্যবর্তী সময়গুলো মায়ের জীবনে স্বত্ত্ব বয়ে এনেছিল। মায়ের মরুভূমির শূন্য বুকে সুখের এক চিলতে পরশ বুলিয়ে যেতে লাগল। জীবনের সুখকর স্মৃতির পাতায় যোগ হয়ে গেল এসব দিনের সমাচার। ফেলে আসা দিনের দুঃস্পন্দন সময়গুলো ধীরে ধীরে বদলে গিয়ে মরুময় বুকে সবুজায়নের অনুভূতি নিয়ে মা একটি নিশ্চিত ভবিষ্যতের অপেক্ষায় সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। মেজ ছেলের ইরান থেকে পাঠানো অর্থ যেন জীবনকে আরো নিরূপিত করতে লাগল। ভাইয়া সপরিবারে দেশে এলে মায়ের বুদুক্ষু মন সুশীতল হতে থাকে। দূর দেশে থাকা বড় সন্তানটিকে স্বল্প সময়ের জন্য কাছে পাবার আনন্দই বা কম কিসে? বিদেশী ছেলের বউয়ের মুখে আচানক মা ডাক শুনে

গোলমেলে হয়ে যায় সব। ছেলেমেয়েদের শৈশব আর কৈশোরে দিনগুলোতে নিজের আঁকড়ে থাকা ইচ্ছে, অনিচ্ছে, স্বাদ, আহ্লাদগুলো আলগা হয়ে যেতে থাকে বেশ অবলীলায়। ছেলে মেয়েদের আহ্বানে পারুল ভবনের গতি পেরিয়ে ঢাকার সীমানায় পৌছে গেলেন মা। সবাই যখন নিজ নিজ সংসার আর কর্মজগতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে থাকল তখন আমার মায়ের ব্যস্ততার পরিমণ্ডলও পরিবর্তিত হতে থাকল। নিজ পরিবারের ভালমন্দের হিসেব করতে করতে জীবনের রঙীন দিনগুলো কখন হারিয়ে গেছে তার হিসেব রাখেননি মা। জীবনের এ পর্যায়ে সন্তানরা বড় হয়ে গেলেও মায়ের সময়গুলো আবার সেই সন্তানদের ঘিরেই ঘূর্ণিয়মান হতে থাকল বিরামহীনভাবে। মা তাঁর সন্তানদের চলার পথকে মসৃণ করে তুলতে পরোক্ষভাবে রয়ে গেলেন তাদের পাশে। বিশেষ করে সংসারের অনভিজ্ঞ আর আবেগপ্রবণ বড় দুই মেয়ে যখন একদিকে চাকুরী আর অন্য দিকে সন্তান লালন পালনে দিশেহারা তখন মা তাঁর শক্তি, সামর্থ্য আর বুদ্ধি দিয়ে সমাধানের পথ বাত্তলে দিতে থাকেন মেয়েদের। যে মেয়েরা ভাইদের প্রতি মায়ের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে কানুকাটি আর রাগ অভিমানে দিনভর মাকে যন্ত্রণায় ফেলত, তারাই তখন উপলক্ষ্মি করল মায়ের অবদান, মায়ের শ্বাশত রূপ।

মায়ের জীবনের আর একটি ক্লান্তিকর অধ্যায়ের কথা না বললেই নয়। এই ক্লান্তিকর অধ্যায়ের শুরু সংসার জীবনের শুরুর দিন থেকে। এ অধ্যায়ে মাকে ব্যস্ত থাকতে হত আবার রান্নার সার্বিক তদারকিতে। এ কাজে অন্য কারো হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল না। রান্না বিষয়ক গবেষণা ছিল আমাদের বাসার একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এ সম্পর্কে পাড়া প্রতিবেশীও সম্যক অবহিত ছিলেন। দৈনিক খাবারে শতেক রকম পরিবর্তন আনার গবেষণাকর্ম মায়ের জন্য তেমন আনন্দের বিষয় ছিল না। ভাইদের বিয়ের পরে রান্নার এ গবেষণায় ভাবীদেরও অংশ নিতে হত। নিত্য নতুন রেসিপি আবিক্ষারে আবার আগ্রহ নতুন মাত্রা পেতে থাকে অবসরের দিনগুলোতে। আম গাছের কচি পাতার ভর্তা কিংবা হেলঘঁ শাকের টক তিতা ঝোল ইত্যাদি তৈরীতে বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগের ফলে স্বাস্থ্যগত সুবিধাদি বিশ্লেষণের আলাপটাও জমে উঠত খাবার টেবিলে। এ ভাবেই পারুল ভবনের সুন্সান অবসর দিনগুলো কাটছিল। এর মধ্যে আবার হঠাত অসুস্থতায় তাঁকে মতিঝিল নাসিং হোমে ভর্তি করা হলে আমরা প্রথমবারের মত সতর্ক হয়ে পড়ি আবার শারীরিক সমস্যাগুলো নিয়ে। এ

অসুস্থতার সময় মেজছেলের দেদার সেবায়ত্তে ১৯৯৩ সনে আব্বা সুস্থ হয়ে ওঠেন।

১৯৯৫ সনের ৪ঠা আগস্ট বেবীর বিয়ের পর মায়ের সাত ছেলে মেয়ের বিয়ের পর্ব সমাপ্ত হয়। বেবীর শৃঙ্গরবাড়ী খুলনা। স্বামী রহ্মান আমীন রিকো বি,সি,এস (কর) ক্যাডারের একজন সদস্য। শুধু বিয়ের বাকী থাকেন সেজ ছেলে, বিনি জীবনের সব পর্ণগুলোতেই সবার পিছনে ছিলেন, ঠিক ছোটছেলের বিপরীতে যার অবস্থান। সাত ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সেজ ছেলের বিয়ের ব্যাপারে মায়ের ঘ্যান ঘ্যানে অনুনয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই সেজ ছেলে বিয়ের ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ ভূমিকায় থাকতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ভোলার বোরহানউদ্দিনে কর্মরত থাকাকালীন ক্রুল জীবনের বন্ধু ডাঃ নজরুল ইসলাম ও সহকর্মীদের সক্রিয় হস্তক্ষেপে তাদেরই পছন্দে সেজছেলের বিয়ের কলে ঠিক হয়। ১৯৯৭ সনের ১৪ই মার্চ সেজ ছেলের বিয়ে হয়ে যায়। আমাদের সেজ ভাবী তাহ্মিনা বেগম, যাকে আমরা বকুল ভাবী বলে ডাকি তিনি চাকুরীজীবি। বি আর ডি বি এর সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন ঘাবৎ মাঠ পর্যায়ে চাকুরী করছিলেন। বর্তমানে বরিশালে কর্মরত আছেন। সেজভাইয়া এ,টি,ই,ও হিসেবে বিভিন্ন জেলায় চাকুরী করে বর্তমানে বরিশালে কর্মরত। সেজ ছেলে ও তার স্ত্রীই আব্বা আম্মার সাথে পারুল ভবনের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে রাইলেন। তবে ঈদ কোরবানীর ছুটিতে পারুল ভবনের নিত্যনৈমিত্তিক দিনগুলোকে বদলে দিতে বরিশালে আমাদের উপস্থিতি হয়ে উঠত আব্বা আম্মার জন্য পরম আনন্দের।

মেয়েদের চাকুরী বা বাইরের জগতে ব্যস্ত থাকার বিষয়ে আমার মায়ের নিজস্ব কিছু ধ্যান-ধারণা এবং মতাদর্শ রয়েছে। ‘মা’ এর কোন বিকল্প নেই বলেই মেয়েদের বাইরে অবস্থান সংসারে যে শূন্যতার সৃষ্টি করে তা পূরণীয় নয়। সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে মায়ের অবস্থান। মেয়েদের চাকুরীর কারণে সংসারের যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে বা জৌলুস আসে তা আপাতঃ দৃষ্টিতে লাভজনক মনে হলেও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তা কতটুকু লাভজনক হবে সে হিসেব নিকেশের প্রয়োজন আছে বৈকি। পরিবারে মায়ের অনুপস্থিতির কারণে সংসারে মানুষগুলোর কোথা থেকে কি ক্ষতি হয়ে গেল তা দেখার বা বোঝার জন্য সময়ের দরকার। কাজেই মেয়েদের বাইরের জগতে ব্যাপ্ত রাখার বেলায় ব্যাপক উদারতা দেখাতে হবে। এ উদারতা মেয়েদের বয়সের ক্ষেত্রেই বেশী

হওয়া উচিত। সন্তান লালন পালন করে তাদের মোটামুটি একটি পর্যায় পর্যন্ত বড় করার পুরো সময়টিতে যেন একজন মা সন্তানের কাছে থাকতে পারেন এরকম ব্যবস্থা থাকলে মেয়েদের চাকুরীতে অসুবিধা নেই। আমি যখন ১৯৯৩ সনে আমার মাত্র এক বৎসরের শিশু সন্তানকে মায়ের কাছে রেখে চৌদ্দ মাসের জন্য যুক্তরাজ্যে পড়াশুনার জন্য পাড়ি দেই তখন মায়ের চোখে গভীর দুঃখবোধ লক্ষ্য করেছি। আমার মায়ের অপরিসীম ত্যাগ এবং কষ্টের বিনিময়ে আমার ডিহুই সম্ভব হয়েছে সত্য। কিন্তু বিনিময়ে অনেক মূল্যবান সময় হারিয়েছি। এরপর ১৯৯৯ সনে দিহুইতে নয় মাসের কোর্সে পড়াশুনাকালেও আমার মা আবারও আমার দুই ছেলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তখন মায়ের চোখে দুঃখবোধের পরিবর্তে ক্ষেত্রের ছায়া দেখেছি। যে মা তাঁর নিজের সন্তানদের এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করেননি, এমনকি বাপের বাড়ীও যাননি, তিনি নিজের মেয়েদের দীর্ঘ সময় বিদেশে লেখাপড়ার এমন সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাননি। আমার মা আমাদের জন্য ঘোলআনা মা হ্বার কারণেই হয়তোবা আজ তাঁর জন্য আমাদের এত শ্রদ্ধাবোধ, মমত্ববোধ আর ভালবাসা। মায়ের ব্যথায় আমরা ব্যথিত, মায়ের সুখে আমরা সুখী। আমরা কি আমার মায়ের মত ঘোলআনা মা হতে পেরেছি, এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই।

নবই দশকের ভারিকি সময়গুলোতে আবো আম্মা দু'জনেই বরিশালের পার্কল ভবনে নিঃসঙ্গতায় হাঁপিয়ে উঠতে থাকেন। একদেয়ে সময়গুলো যেন কাটতে চাইছিল না। ঢাকার ছেলে মেয়েরাও জগাখিচুরি একটা নিরানন্দ সময় পার করছিল। এধরনের বৈরিতা থেকে রেহাই পাবার জন্য আমাদের চেষ্টার ক্রটি ছিল না। তাই “বিমল প্রভাতে মিলি এক সাথে”-এমন একটি অনুষ্ঠানের আইডিয়া মীনার মাথায় বুদবুদ সৃষ্টি করতে থাকে। ১৯৯৮ সনে পারিবারিক পুনর্মিলনীর মাধ্যমে সব ভাইবোনকে আবো আমার সামনে হাজির নাজির করে তাদের নির্মল আনন্দদানের এমন প্ল্যান নিয়ে মীনা সিরিয়াসলি কাজ শুরু করে দেয়। অনুষ্ঠানসূচীসহ আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দেয়া হয় দেশ বিদেশের সবাইকে। সংসার আর কর্মসূলের বহুমুখী সমস্যার মাঝে তিনিদের এ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের জন্য সময় ম্যানেজ করা কঠিন হলেও সবার ঐকান্তিক ইচ্ছায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয়েছিল। ভাইয়া আর রূবী ঠিক সময়ে বিদেশ থেকে চলে এসেছিল। তারা ঢাকা পৌছানোর পর ঢাকায় থাকা অন্য সবাই একত্রিত হয়ে ঢাকা টু বরিশাল এ যাত্রা শুরু মধ্য দিয়ে এ মহাপরিকল্পনার প্রথম দিনের সূচনা হয়। আমরা নৌপথে ঐতিহ্যবাহী ‘অস্ট্রিস’ জাহাজের প্রায়

সবগুলো কেবিন রিজার্ভ করে যাত্রা শুরু করি। আমাদের যাত্রা শুরুর সংবাদে মায়ের মনের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তা পরিমাপ সম্ভব হয়নি। পুনর্মিলনীর প্রথম ক্ষণটি থেকেই মায়ের মনে আশা নিরাশার সাথে ভয় ভীতির এক মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। বরিশালে পৌছানোর পর পারল ভবনের কাছাকাছি এলে যে দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল অকল্পনীয়। মায়ের সব ছেলে মেয়ে আর নাতি নাত্নীর বিশাল বহুর দেখে কাজীপাড়ার পাড়া প্রতিবেশীরা হতচকিত দৃষ্টিতে এ মিছিল দেখতে থাকেন। সেজ ছেলে সকালের নাস্তার দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার পর সারাদিন মা ও আবার সাথে নির্মল গল্ল গুজব আর আনন্দে কোথা থেকে সময় কেটে যায় তা কেউ টের পায়নি। আনন্দঘন সময়গুলো খুব দ্রুতই কেটে যায় বলে সে সব সময়ের কাছে আমরা ঝল্লি হয়ে থাকি। সন্ধ্যার সময় সব নাতি নাত্নীদের নিয়ে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচ, গান, কৌতুক আর কবিতা আবৃত্তি করে প্রতিভাধর নাতি নাত্নীরা জিতে নেয় হরেক রকম পুরস্কার। পরের দিন যাত্রা শুরু হয় কুয়াকাটা থেকে ঐ অঞ্চলের সব দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। ভ্রমণের শেষ দিনে বদরপুরে অবস্থান এবং সেখানে বহু আপন ও জীবনের কোন এক সময়ের ঘনিষ্ঠজনদের সাথে মিলিত হবার এমন সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। বিশেষ করে আবার জন্য ছিল এ ভ্রমণ এক দুর্লভ মুহূর্ত। তাই এ ভ্রমণের সব কিছু স্মৃতিতে ছাপ রেখে গেল আজীবনের জন্য। আবরা আম্মার অনাবিল আনন্দের মুহূর্তগুলো শেষ হয়ে গেল। ভবিষ্যতে সন্তানরা এভাবেই একত্রিত হয়ে পারিবারিক বন্ধনটি আরো মজবুত করবে, সবাই থাকবে সবার পাশে বিপদে আনন্দে সব সময়ে-আবরা আম্মার প্রাণভরা এ দোয়ার মাধ্যমেই অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে চলে এলাম আমরা। “পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায় সে যে চোখের দেখা প্রাণের কথা সেই কি ভোলা যায়-” সব ছেলেমেয়েদের সমবেত কঠে এ গানটি দিয়ে শেষ হয়ে যায় পারিবারিক পুনর্মিলনী ১৯৯৮।

পারিবারিক পুনর্মিলনী শেষ হলেও এর রেশ রয়ে গেল বহুদিন। মা উপলক্ষ্মি করতে লাগলেন তার সন্তানরা একই সুতায় গাঁথা মালার মত জড়িয়ে আছে। শৈশবের মতই তারা একে অন্যের বন্ধু আর সহমর্মীর মত রয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কের বাঁধন দূরত্বের প্রাচীর অতিক্রম করে মিলিত হয়েছে একই সৃত্রে। বিশেষ করে ছোট ছেলেটির মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করতে থাকেন মা। বিয়ের পর পর ছোট ছেলেটি তার পরিবার ও চাকুরীর ব্যস্ততায় কিছুটা খাপছাড়া হয়ে গিয়েছিল। পারিবারিক পুনর্মিলনীতে ছোট ছেলেটির সেই খাপছাড়া ভাবটি আর

অনুভূত হ'ল না। বরং এ অনুষ্ঠানে তার ভূমিকা ছিল অন্যদের চেয়েও কয়েক মাত্রা সরেস। সেজ ছেলে পুরো অনুষ্ঠানের সময়ের আর মেজ ছেলে হিসাব নিকাশের দায়িত্বে পারফেক্ট ছিলেন। বড় ছেলে সবার উৎসাহদাতা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্বে বেশ মানিয়ে গেছেন। মেয়েরাও খুঁটিলাটি সব বিষয়গুলো সামলে পুরো তিনদিনের সময়গুলোকে আনন্দময় রেখেছিল। এ ধরনের পুনর্মিলনী আবারো হয়েছিল ২০০২ সনে ঢাকায়। তখনও পরিবারের সদস্যদের একশত ভাগ উপস্থিতিতে চমৎকার সময় কেটেছিল। পারিবারিক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয় সবার সময়মত অংশগ্রহণের বিষয়টি। কিন্তু ২০০২ সনের পুনর্মিলনীও প্রমাণ করেছিল আমরা সবাই একত্রে মিলিত হবার জন্য নিজেদের সব দায়িত্বের বোর্ডা থেকে মুক্ত করতে কঠটা আন্তরিক। আমার মায়ের স্মৃতির পাতায় সন্তানদের সেই সব আয়োজনের খন্দ খন্দ ঘটনা চলচিত্রের ছবির মতই চোখের সামনে ভেসে আসে। এরপর আরো একটি পারিবারিক পুনর্মিলনী হয়েছিল ২০০৭ সনে। সেসব কথায় ফিরে আসব আবার।

সময় গড়িয়ে চলল। ২০০০ সালে আমরা সবাই মোটামুটি একটি স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছে গেলাম অর্থাৎ সংসার পরিচালনায় পরিপন্থতা এল আর কর্মসূলের দায়িত্ব পালনে পেশাগত দক্ষতা বাড়ল। এর মাঝে মেজভাইয়া লন্ডনে এক বৎসর উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরেছেন। তিনি আবারও নাইজেরিয়া যাবার একটি অফার পেয়েছেন। এসব তখন আমাদের পরিবারের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। রুবীও দেশে আড়াই বছর অতিবাহিত করে আবার নিউইয়র্কে চলে যাবার দিন গুলিল। সোনাভাই চিটাগাং থেকে ঢাকায় বদলী হবার অপেক্ষায় রয়েছেন। ভাইয়া রাশিয়ার পাট চুকিয়ে কানাড়ায় অভিবাসনের জোর চেষ্টারত। আমাদের চাকুরী চলছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে। ছেলেমেয়েদের এরকম একটি পর্যায়ে আবরা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আবরা অতিমাত্রায় স্বাস্থ্য সচেতন এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলায় নিয়মানুবর্তী একজন মানুষ ছিলেন বলেই তিনি অনেকে রোগের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র বার্ধক্যের কারণে আবরা দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলেন। দীর্ঘদিনের জন্য রুবী নিউইয়র্কে চলে যাবার আগে আবরা আম্মা দু'জনেই ঢাকা বেড়াতে এসেছিলেন। এরপর আবার আর ঢাকা আসা হয়নি। বরিশালে ফিরে যাবার পর থেকে আবরা প্রায় অসুস্থ থাকতেন। আমরা যখন বরিশালে বেড়াতে যেতাম তখন খুব ভোররাত

থেকে আবো আমাদের পথ চেয়ে অপেক্ষা করতেন এবং সবার আগে তিনিই দরজা খুলে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতেন। বয়সের কারণে দুর্বল হয়ে যেতে থাকলে আবো আমাদের জন্য দরজা খুলে অপেক্ষা করতে পারতেন না। আবোর এ অক্ষমতা আমাদের মনকে কিভাবে পীড়িত করেছিল তা সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আজও অনুভব করতে পারি। অসুস্থতার কারণে আবোকে ২০০৪ এর জানুয়ারী ও অক্টোবর এ বরিশাল মেডিক্যাল ভর্তি করানো হয়েছিল। দুবার আবো সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরলেও তৃতীয়বার আবো আর বরিশাল মেডিক্যাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসেননি। মায়ের টেলিফোনে আবোর খাওয়া দাওয়া বক্তব্যের খবরে আমরা বরিশালে যাবার একদিন পরে আবো ভোর রাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাঙ্গারদের আগ্রাণ চেষ্টায়ও কোন ফল হয়নি। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে একানকাই বছর বয়সে আবো ইন্টেকাল করেন। আবোর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবারে ভাঙনের যাত্রা শুরু হ'ল। আবোহীন এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যে কি কষ্টের তা প্রতিটি মুহূর্তেই অনুভব করতে থাকি আমরা-তাঁর সন্তানরা। আবোর মৃত্যুকালীন সময়ে ডাঙ্গার ছেলে অর্থাৎ মেজভাইয়া, রঞ্জী আর ভাইয়া দেশে ছিলেন না। বিদেশ বিভুইয়ে আবোর মৃত্যুর সংবাদ তাদের জন্য কত না কষ্টকর ছিল। সেজভাইয়া আর সোনাভাই এর সাথে আমাদের উপস্থিতিতে আবোর অস্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে বদরপুর দরবার শরীফ সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। একজন প্রচারবিমুখ আর নিভৃতচারীর এপিটাফে লেখা হ'ল তাঁরই কবিতার চরণ,

“এইখানে শায়িত আছে কবি একজন  
ভালবেসে কে তাহারে করিবে স্মরণ।”

আমার মায়ের একান্ন বৎসরের দান্পত্য জীবনের সমাপ্তি হল। মা হলেন একা। আমরা সবাই ঘিরে রইলাম মাকে তাঁর এ সীমাহীন নিঃসঙ্গ মৃহূর্তগুলোতে। আবোর চশমা, ব্রিফকেস, পাতার পর পাতায় লেখা কত কথা, এক যুগের বেশী সময় ধরে হাতে লেখা ডাইরী আর প্রতিদিনের খবরের কাগজের স্তুপ সব রয়ে গেল স্মৃতির স্মৃতি হয়ে। আবিস্কৃত হল আবোর আরো কিছু অপূর্ণ ইচ্ছার কাহিনী। ব্রিফকেসের ভিতরে স্যাত্ত্বে রেখে গেছেন তার অসমাপ্ত কর্মসূচী এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্তদের তালিকা। বদরপুর গ্রামের মানুষকে আলোকিত করার সব প্রকল্প ও পরিকল্পনার নিখুঁত আর নির্ভুল স্বহস্তে লেখা

সারি সারি কাগজপত্র দেখে আবার ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম আমরা। একটি কাপড়ের থলেতে দশ হাজার ছাপান্ন টাকা পঞ্চাশ পয়সা পাওয়া গেল বিফকেসের এক কোণায়। এ অর্থ তিনি পেনশনের টাকা থেকে অল্প অল্প সঞ্চয় করেছিলেন তাঁর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের আশায়। এ টাকার সাথে সব ছেলেমেয়ের পক্ষ থেকে অর্থ দিয়ে একটি তহবিল গঠন করে শিক্ষা, বৃক্ষরোপণ, মৎস চাষ আর মেয়েদের সেলাই প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখিয়েছেন তিনি তাঁর সন্তানদের। চাচাত, ফুফাত, ভাইয়েরা যারা আমাদের বাসায় থেকে পড়াশুনা করেছেন তাদের অংশগ্রহণের কথা বাদ যায়নি আবার প্রকল্প থেকে। আবার মৃত্যুতে আমরা মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে গেলাম। প্রথমবারের মত অনুভূত হল প্রিয়জন হারাবার ব্যথা কত কঠিনভাবে বুকের পাঁজরে আঘাত হানতে পারে। কঠিন পরিস্থিতে সবাই যখন দিশেহারা হয়ে পড়ত, শূন্য হাতে তখনও আবা হতাশ হতেন না। তিনি হার না মানা একজন মানুষ। সেই হার না মানা মানুষটি চলে যাবার পর সব কিছুতেই স্থবিরতা শুরু হ'ল। এরকম এক স্থবির সময়ে মেজভাইয়া নাইজেরিয়া থেকে দেশে ফিরেছিলেন। তবে রুবীর তখনও দেশে ফেরার সুযোগ হয়নি।

আবার পরিণত জীবনাবসান বিমূর্ত বেদনায় অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থায়ী হলেও আমাদের ফিরে যেতে হয় কর্মক্ষেত্রে এবং অভ্যন্ত হতে হয় চিরচেনা রঞ্চিন কাজে। তমসাচ্ছন্ন পারকল ভবনে পারকলের বসবাসের বাইরে অন্য কোন বিকল্প রইল না। তিনি একাকী রয়ে গেলেন নিজের প্রিয় পারকল ভবনে। ঢাকা এসে আমাদের কারো বাসায় থাকার কোন আগ্রহ মায়ের মধ্যে দেখা গেল না। সময় অসময়ে শুধু মায়ের জন্য অজানা ব্যথায় মন অবরুদ্ধ হয়ে থাকত। ঢাকার বন্দী জীবনে মাকে বন্দী করার দুঃসাহস দেখাতে কেউ আর সাহস দেখাত না। এরকম একটি অবস্থায় মায়ের ছোট ছেলে কুটু গাজীপুরের মেশিন টুলস্ ফ্যাট্টের যোগদান করার পরে দৃশ্যপটে পরিবর্তন দেখা দিল। গাজীপুর বাসার খোলামেলা চমৎকার পরিবেশটি মায়ের জন্য বেশ উপযুক্ত ছিল। বাসাটি তিনতলা পর্যন্ত হলেও নীচতলায় মায়ের থাকার ব্যবস্থা থাকায় সিঁড়িতে ওঠানামায় সমস্যার বালাই নেই। তখন ঢাকা আসার ব্যাপারে মায়ের আর শক্ত কোন অজুহাত দেখাবার সুযোগ থাকল না। এরকম একটি প্রিয়মাণ সময় থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসতে এমন পরিবেশের প্রত্যাশা ছিল আমাদের সবার। এ ছাড়া ছোট ছেলের শক্তিশালী নেটওয়ার্কের কারণে গ্রামীণ আত্মীয় অনাত্মীয় থেকে শুরু করে ঢাকায় বসবাসরত আত্মীয় স্বজনদের সাথে যোগাযোগের বিষ্টার

লাভ সহজ হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় অনেক কাছের আত্মীয় স্বজনও অপরিচিত হয়ে যাচ্ছিল। সেসব আত্মীয় স্বজনের সাথেও ছোট ছেলে পুরোদমে যোগাযোগ তৈরী করেছিলেন। বিশেষ করে ঢাকায় বসবাসরত আমার মায়ের শৈশবের খেলার সাথী চাচাত বোনরাও সোনাভাই এর নেটওয়ার্কের আওতায় চলে আসেন। এসব কারণে ছোট ছেলের উপর মায়ের নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকল। তবে একথাও ঠিক যে, সেনাবাহিনীতে চাকুরীর কারণে আত্মীয় স্বজনরা বিভিন্ন কাজে সোনাভাইয়ের কাছে আসত বলেও এ ধরনের একটি সেতুবন্ধন তৈরী হতে সময় লাগেনি। শুধু সবার সাথে যোগাযোগ রক্ষাই নয় বরং তাদের প্রতি সোনাভাইয়ের উদারতা এবং আন্তরিকতার সংবাদে এ ছোট ছেলের প্রতি মায়ের বাড়তি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখা যেত। আত্মীয় স্বজনের ছোটখাট সমস্যা সমাধানে সব সময় সোনাভাইয়ের ডাক পড়ত। কারো বাসার টি.ভি. কম্পিউটার কিংবা ইলেক্ট্রিক্যাল ইকুপমেন্টে কোন সমস্যা দেখা দিলে সেখানেও তিনি। সেনাবাহিনী কমিশনপ্রাণ অফিসার হয়েও তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর একজন প্রকৌশলী। গাজীপুর মেশিন টুল্স ফ্যাস্টেরীতে টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিটে জি.এম এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন ২০০৫-২০০৭ সাল পর্যন্ত। এভাবেই মায়ের হারিয়ে যাওয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলো আবারও নতুনভাবে তৈরী হতে থাকল। বিশেষ করে ছোট ভাই কৰীর এর সাথে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তাকে একেবারে মায়ের কাছাকাছি নিয়ে এল সোনাভাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার জন্য বারিশাল ছেড়ে আসার পর তিনি চিরতরেই ঢাকার মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের সাথে শেষ পর্যন্ত ছোট মামার শুধু নামমাত্র যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। তাই দীর্ঘসময় ধরে মায়ের জীবনে তার অবস্থান ছিল শুধু একটি ঘটনার মত। ছিটেফোটা ঝোঝখবর নিতে নিতে ছোট মামার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকেন সোনাভাই। মামা ও সোনাভাইয়ের বাসায় অল্লিভিস্ট আসা যাওয়া করতে করতে উভয়ের সম্পর্কটা বন্ধুত্বে রূপ নিয়েছিল। তবে এজন্য সোনাভাই এর গাজীপুরের বাসাটির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। প্রকৃতি প্রেমিক ছোট মামা গাজীপুরের বাসার প্রতি তীব্রভাবে দুর্বল ছিলেন। বাসাটির পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ ছিল নয়নাভিরাম। দূর থেকে দেখলে মনে হত চারিদিকে ঘন গাছগাছালির ছায়ায় ঘেরা বনের ভিতরে হঠাত করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সাদা তিনতলার একটি বাড়ি। সবুজ প্রান্তরের এমন অফুরন্ত বিশুদ্ধ বাতাসের বড় অভাব ঢাকা শহরে। খুব ভোরে নাম না জানা পাখির ডাক, সন্ধিয়ায় ঝাঁঝ পোকার একটানা গান আর রাতের আকাশে তারার মেলায় ছোট মামা হারিয়ে যেতেন তার ফেলে আসা দিনগুলোতে। বাগান ভর্তি টাটকা

সবজি, ফলফলাদি, সেই সাথে শিমুলতলী বাজারের তাজা মাছের ছড়াছড়ি সব মিলিয়ে সোনাভাইয়ের বাসাটি ছিল সবার পছন্দের অবকাশ যাপন কেন্দ্রের মত। ছোট মামা বুখাইনগর গ্রামের স্মৃতিগুলো ফিরে পেতেন গাজীপুরের সেই নৈসর্গিক পরিবেশে। দিনে দিনে মামা ভাগ্নের সম্পর্ক অন্তরের সম্পর্ক হয়ে উঠতে লাগল, এসব খবর মা শুধু দূর থেকে শুনতেন। এভাবে মামার জীবনে না বলা অনেক কথাই আমরা জানতে শুরু করলাম। মামীর সাথে খাপ খাইয়ে নেবার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল তখন দাম্পত্য জীবনের সম্পর্কের গভীর ফাটল বিছেদের কারণ হয়ে দাঁড়াল। একমাত্র সন্তান ডনও থেকে গেল তার মায়ের সাথে। ১৯৮৭ সালের কোন এক সময়ে মামার সাথে মামীর ডিভোর্সের পর মামা পুরোপুরি সংসার ত্যাগী এক যায়াবর হয়ে গেলেন। অসমাঞ্ছ লেখাপড়ার কারণে ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে পড়েন এককালের মেধাবী এই মানুষটি। এ সময়ে তিনি নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। তাই ছোট মামা সব কিছু ছেড়েছুড়ে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিলেন। এই একাকী জীবনের সব দুঃখ কষ্ট তিনি কাউকে শেয়ার করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামা ভাগ্নের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বিস্তার ছোট মামাকে আমাদের সবার সান্নিধ্যে নিয়ে এল। মা তার ছোট ভাইটির সারা জীবনে ভালবাসার তীব্র অভাববোধের অভাব পূরণ করতে না পারলেও সীমাহীন ভালবাসা নিয়ে আবারও ছোট ভাইটির জন্য প্রসারিত করলেন তাঁর দু'টি হাত।

সময়গুলোর বন্ধ্যাত্ত কেটে যেতে থাকলেও আবার অভাব যেন কিছুতেই পূরণ হচ্ছিল না। আলমারীতে থরে থরে সাজানো বইপত্র পড়ে রইল। আবার পারিবারিক লাইব্রেরী করার স্বপ্ন আর সত্যি হল না। নিকনো উঠোনে ঝারা শিউলী ফুলের বিছানা আর বাসার সামনে ছোট ফুল বাগানের সব ফুলগুলো সুবাস ছড়িয়ে আবার কথা মনে করিয়ে দিতে থাকল। ব্রিফকেসে সংযোগে সাজানো কাগজপত্র আর মানুষকে আলোকিত করার প্ল্যান প্রোগ্রাম সব কিছুই নিঃশব্দে আবার অন্তিম ইচ্ছাগুলো পূরণের কথা বার বার মনে করিয়ে দিতে লাগল। দাদীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণে কত না ত্যগ স্বীকার করেছিলেন আমার আবার। তাই আবার ইচ্ছাগুলো পূরণের ইচ্ছা আমাদের বোধশক্তিকে নাড়া দিতে থাকল অনবরত। আমাদের এসব ভাবনাগুলোতে মায়ের উৎসাহ যোগ হয়ে “কিছু একটা করা দরকার” অন্তরের মাঝে এমন তাগিদে শেষ পর্যন্ত মীনা আর আমি এগিয়ে এলাম আবার অন্তিম ইচ্ছাপূরণের দায়িত্ব পালনে। কাজ

শুরু হ'ল বদরপুর গ্রাম থেকে। আবুরা জীবিত অবস্থায় বদরপুরের সাথে আমাদের যোগাযোগ তেমন ছিল না বললেই চলে। আবুরা মৃত্যুর মধ্য থেকে আবার তৈরী হ'ল বদরপুরের সাথে যোগাযোগের নতুন অধ্যায়। তবে ছোটবেলায় দেখা বদরপুর গ্রামের চিত্র এতদিনে অনেক বদলে গেছে। গ্রামের মানুষজন আগের চেয়ে চিন্তা ভাবনায় এগিয়ে গেছে। নগর জীবনের সংস্পর্শে এসে সামাজিকতা, আচার ব্যবহার ও মনমানসিকতায় এসেছে পরিবর্তন। ক্ষুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ অবকাঠামোগত অনেক পরিবর্তন সাধিত হলেও এ গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থার তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। আমার বড় চাচার ইত্তেকালের পর আমাদের চাচাতো ভাইয়েরা গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক জনহিতকর কাজকর্ম করে আসছিলেন। এর মধ্যে বড় চাচার ছেলে মাওলানা আব্দুর রব যিনি ঢাকার পাটুয়াটুলী মসজিদের প্রধান ইমাম তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে বদরপুর গ্রামে মসজিদ মাদ্রাসা স্থাপনে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তাঁরই উদ্যোগে বদরপুরে ব্যাপক ইসলামী কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। বর্তমানে পাঁচতলা ভবনের মাদ্রাসার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। এছাড়া প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে তিন দিন ব্যাপী এক বিশাল ওয়াজ মাহফিলে ঐ অঞ্চলের প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়ে থাকে। এসব ইসলামী কর্মকাণ্ডের জন্য ইতোমধ্যে বদরপুর গ্রামটি দক্ষিণ অঞ্চলে বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। তবে চাচাত ভাইদের এসব কাজের সাথে আমাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল না। আবুরা চাকুরীর কারণে গ্রামের বাড়ী এবং আঞ্চলিক স্বজনের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিল অনেকটা অর্থ কিংবা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করা এ পর্যন্ত। আঞ্চলিক স্বজনের অনেকেই আমাদের বাসায় থেকে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেছিলেন। শুধু নিজ গ্রামের অবকাঠামোগত কিংবা অন্যান্য উন্নয়নের ব্যাপারে আবুরা এককভাবে কিছু কাজ করেছিলেন। এর মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু আবুরা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের অনুভূতিতে বদরপুর গ্রামের উন্নতির জন্য কাজ করার তাগিদ তৈরী হয়েছিল। ভবিষ্যৎ বদরপুরের চিত্র বদলে দিতে আমরা একটি শক্তি অনুভব করলাম। আমাদের প্রিয় দাদীর সেই ভিটেতেই গড়ে তোলা হ'ল Society for Orientation Unity and Liberty (SOUL) নামের প্রতিষ্ঠানটি। বদরপুর গ্রামের মেয়েরা সেলাই প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে আসার সুযোগ পেল। গ্রামের যুবকরা পেল বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ। “মুসলিম আলী স্মৃতি যুব ক্লাব” এর কাজ শুরু হল অঙ্গুয়াভাবে একটি ছোট ভাড়া ঘরে। গ্রামের মানুষজন আমাদের উৎসাহের উৎস হয়ে

মনোবল বাড়িয়ে দিল বহুগণ। এসব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে রাস্তা হল, আলোয় প্লাবিত হ'ল মৃধাবাঢ়ীর প্রতিটি ঘর। প্রতি বৎসর আবার কবর জিয়ারতে গিয়ে আমাদের গ্রামের সাথে হয়ে গেল প্রাণের সম্পর্ক। এসব কাজের আর্থিক দায় দায়িত্ব আমরা তিনি ভাইবোন অর্থাৎ সোনাভাই, শীনা এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বহন করলাম। অন্যান্য ভাই বোনও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের আর্থিক ও অন্যান্য সব ধরনের সহযোগিতা করেছিলেন। তবে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল আমাদের সব কাজের নেপথ্যে যাঁর ক্লান্তিহীন সমর্থন, উপদেশ এবং কূটনৈতিক বুদ্ধি বিবেচনার বিমূর্ত সাড়া পেয়েছিলাম তিনি হলেন আমাদের মা-শামসুন্নাহার বেগম পার্কল।

ছয়.

২০০৬ সাল থেকে বদরপুরে যে কর্মসূক্ষ শুরু হয়েছিল তা চালিয়ে নেবার জন্য যথেষ্ট সময়, অর্থ আর নিবিড় তদারকির প্রয়োজন দেখা দিল। নগরজীবনের ব্যক্তির মাঝে এ কাজগুলো পরিচালনায় আমাদের অভিজ্ঞতার অভাব থাকলেও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। শৈশবের দিনগুলোতে আমরা দু'বোন গ্রামীণ আঞ্চীয় স্বজনের সংস্পর্শে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম না। এ নিয়ে মায়ের ব্যাপক অভিযোগও ছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে আমাদের মন্তচক্ষুও উন্মোচিত হল। আমরাও সব ভেদাভেদ ভুলে গ্রামের অশিক্ষিত, দরিদ্র আর অসহায় মানুষের জন্য দিন রাত পরিশ্রম করে যেতে থাকলাম। উত্তরাধিকার সূত্রে আবার মালিকানাধীন জমির বেশীর ভাগই তিনি স্কুল, মাদ্রাসা কিংবা জনহিতকর কার্যে দান করে গিয়েছিলেন। অবশিষ্ট অল্প জমির মধ্য থেকে দাদীর ভিটায় সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এবং “মুসলিম আলী স্মৃতি যুব ক্লাব” এর জমি পাওয়া একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। আমাদের এই কঠিন সমস্যায় মায়ের চৌকস পরামর্শ ছিল সময়োপযোগী। বিশেষ করে যুব ক্লাবের জমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি এমন একখন্দ জমি নির্বাচন করলেন যার মাধ্যমে নিকট আঞ্চীয় স্বজনের মনের সুপ্ত কিছু নীরব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। মায়ের পাশাপাশি আমরা সোনাভাইকেও পেয়েছিলাম একান্তভাবে। তবে অন্য সবাই তাদের রঞ্চিন জীবনে বাইরে এসে সময় দেবার মত সময় পেতেন না। আবার অনেকে ছকে বাঁধা নৈমিত্তিক চলমান জীবনের নিরাপদ সময়গুলো উপভোগের আনন্দ থেকে নিজেদের বাধিত করায় আঁধাহী ছিলেন না। কিন্তু মায়ের ছোট ছেলে ছিল ব্যতিক্রম। তিনি সময়কে অতিক্রম করেছিলেন।

সময়কে তিনি ব্যবহার করেছিলেন যথেচ্ছাভাবে। ‘যথেচ্ছা’ কথাটির একটা ব্যাখ্যাটা এরকম যে, তিনি একই সময়ে অনেকগুলো কাজ একই সাথে নিরাঙ্গিনী মাথায় চালিয়ে যেতে পারতেন। শত ব্যক্ততার মধ্যেও প্রতিটি কাজে তিনি বুদ্ধি, পরামর্শ আর আর্থিক সহায়তা দিয়ে আমাদের সাহস যোগাতেন। সব চেয়ে বড় সুবিধা ছিল সবার কাছে তার গ্রহণযোগ্যতার কারণে গ্রামীণ পলিটিক্স কিংবা অন্য যে কোন ধরনের অনভিপ্রেত বিরোধিতা শরতের মেঘের মত কেটে যেত। তিনি বদরপুরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন এ গ্রামের সম্ভাবনাগুলোকে খুঁজে বের করার জন্য। গ্রামটিকে একটি ‘মডেল ভিলেজ’ করার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন তিনি। পর্যটন এলাকা হিসেবে কুয়াকাটার গুরুত্ব বাড়ার সাথে সাথে আমাদের গ্রামটির গুরুত্ব বেড়ে যাবে-এসব দূরদৃষ্টি থেকে তিনি এ গ্রামের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিয়ে তার ভিশন তৈরী করেছিলেন। তার দূরদৃষ্টির কারণে আমরা আরো বেশী বেশী স্বপ্ন দেখতে গুরু করেছিলাম। মূলতঃ আমরা তিনি ভাইবোন মিলেই আবার ইচ্ছাগুলোর বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলাম। আবার অসমাঞ্চ কাজগুলো করতে গিয়ে বদরপুরের মানুষজনের সাহায্য, সহযোগিতা এবং সমর্থনও কম পাইনি। গ্রামবাসীর সহযোগিতা পাবার পিছনে কারণ ছিল আখন্দ পরিবারের প্রতি মানুষের ভালবাসা আর গ্রহণযোগ্যতা। যদিও প্রথম পর্যায়ে এধরনের কাজে অনেকে উৎসাহ দেখালেও বাস্তবের চিত্র অনেক সময় বিপরীত হতে দেখেছি। মানুষের কথা ও কাজে এ ধরনের বৈপরীত্য আমাদের হতোদ্যম করেনি। বরং আমাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। চাচাত আর ফুফাতো ভাইদের মধ্যে দু’একজন তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য করলেও কেউ কেউ কথা রাখেনি। আমার বড় চাচার নাতি মুতাওয়াকিলের আগ্রহ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ২০০৭ সনের বাংলাদেশের উপর বয়ে যাওয়া প্রলয়ঙ্কারী বড় ‘সিডর’ এ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের দুর্লভ অভিজ্ঞতা মীনার জীবনের একটি স্মরণাত্মীত ঘটনা। মানুষের দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়াবার এবং সাহায্যের দু’হাত প্রসারিত করায় এলাকার সবার মনে আমাদের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা আরো বাড়িয়ে দিল। ‘সিডর’ এর সময়ে দিশেহারা গ্রামীণ মানুষ দানীর সেই ভিটে বাড়ীতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা SOUL এ আশ্রয় পেয়েছিল। নিজেদের গ্রামের এসব পরিবর্তন বিদেশে অবস্থানরত ভাইয়া আর ঝুঁকীর পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। আবার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য বদরপুরের পরিবর্তনগুলো স্বচক্ষে দেখার আশায় তারাও অস্ত্রি হয়ে উঠেছিলেন।

সময়ের গতি এল। জীবনেও গতি এল। সেই গতিকে আরো বেগবান করার জন্য সব ভাইবনের আবার একত্রিত হবার প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকল। সময়ের এরকম একটি পর্যায়ে সোনাভাই ২০০৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পারিবারিক পুনর্মিলনীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আবার মৃত্যুর পর মায়ের মানসিক ও শারীরিক উভয় দিকের সুস্থিতার জন্য দৈনন্দিন রুটিন জীবনের বাইরে এ ধরনের একটি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে আবারও সব ভাইবনে একত্রিত হলে মা সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হবেন-এমন ভাবনায় ছোট ছেলে শামসুল আজম কুটু এই অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। আবার অনুপস্থিতির কষ্ট নিয়ে এবারের পুনর্মিলনীতেও আমরা আট ভাইবন এক সাথে মিলিত হলাম। রুবী আর ভাইয়ার উপস্থিতি এ আয়োজনকে পরিপূর্ণতা দিয়েছিল। এবারের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল ভাইয়ার একমাত্র মেয়ে সাবিনাকে ঘিরে। সাবিনা প্রথমবারের মত বাংলাদেশে এসে সবাইকে আপন করে নিল। রুবীর মেয়ে শীম ও সাবিনা প্রায় সমবয়সী। আবু মামা, মামী, কবীর মামা, নেলী, সিনথিয়া ছাড়াও ঢাকার আপনজন সবাই এ আনন্দ মেলার শরিক হয়েছিলেন। মায়ের নাতি নাত্নীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছাড়াও এবার ভাবী আর বোনদের দৌড় প্রতিযোগিতা ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ। খালাত ভাই মায়নের স্ত্রী শামী দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হবে, এরকম একটি ভাবসাব নিয়ে খেলার মাঠে হাজির হলেও মাঝাপথে পড়ে যাওয়ায় তার প্রথম হওয়া ভাগ্যে জুটল না। দৌড় প্রতিযোগিতায় তার হেরে যাবার আফসোসাটি শামী এখনো ভোলেনি। মায়ের বড় নাতি তানিম সারা অনুষ্ঠানের ঘোষক হিসেবে ছিল অনবদ্য। পুনর্মিলনীর দ্বিতীয় দিনে সবার জন্য অপেক্ষা করছিল আরেক বিস্ময়। রাতেই ঘোষণা করা হল পরের দিনের কর্মসূচী। খুব ভোরে হাইকিং এ যেতে হবে সবাইকে। হাইকিং অর্থ হল পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা অনেক পথের দূরত্ব। ইতিপূর্বে এ ধরনের কোন ইভেন্টের সাথে আমরা কেউ পরিচিত ছিলাম না বলে এ ইভেন্টে অংশ নেব কি নেব না এ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে সবাই ঘূরপাক খেতে থাকে। কিন্তু ছোট মামা আর সোনাভাই বিষয়টি পরিষ্কার করে বলার পর এ পর্বে অংশ নেয়ার জন্য ইয়াং গ্রুপ আগ্রহ দেখাতে থাকে। তবে শামী এবারের পর্বে অংশগ্রহণ না করার অনেক অজুহাত দিয়ে আগেই আত্মসমর্পণ করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত প্রায় পনের জনের সম্মতি পাবার পর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রাতেই সম্পন্ন করা হয়। সবার জন্য পর্যাপ্ত কেডস্, হ্যাট আর পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করেই সোনাভাই ঘূরাতে গেলেন। পরদিন খুব

ভোরে পনের জনের দলকে নেতৃত্ব দিয়ে সোনাভাই যাত্রা শুরু করেন। গাজীপুরে তার বাসা ‘অরনিমা’ থেকে দীর্ঘ আট মাইল হেঁটে রাজেন্দ্রপুর ক্যাটনমেটে পৌছানোর পর অফিসার্স মেসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন সোনাভাইয়ের কিছু সহকর্মী। হালকা নাস্তা ও ঠাণ্ডা পানীয় পান করার পর আমাদের বাসায় ফিরে যাবার জন্য রাখা হয়েছিল বেশ ক'খানা গাড়ী। সবার পায়ের এমন শোচনীয় অবস্থা হল যে ঐ মুহূর্তে গাড়ীগুলো ছিল আমাদের সোনার হরিণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় গাড়ীতে ওঠার আগে ছোট মামা আর মেজভাইয়াকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বলাবাহ্ন্য থার্থমিক পর্যায়ে এ পর্বে তাদের উৎসাহ ছিল সর্বাধিক। পরে জানা গেল কবীর মামা বনবাদাড়ে নতুন নতুন পাথি আর পাথির গানে এতই তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন যে, হাঁটতে ভুলে গিয়ে তিনি চা পানে ব্যস্ত ছিলেন। তার সঙ্গী হয়েছিলেন মেজভাইয়া। বাসায় ফিরে ভাবীর তৈরী বিশেষ ব্রেকফাস্ট না খেয়েই সবাই লম্বা হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়টি ছিল সোনাভাইয়ের আট নয় বৎসরের ছোট ছেলে দীপ এ হাইকিং এ অংশ নিয়ে আট মাইল হাঁটার রেকর্ড তৈরী করেছিল। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে পৌছে গেলাম আমরা। শেষ দিনে ভাই বোন বনাম ভাবী দুলভাইদের রঞ্জ টানাটানির প্রতিযোগিতায় ছিল টান টান উভেজনা। এ প্রতিযোগিতায় ভাবী দুলভাইয়া জিতে গিয়ে শুধুমাত্র আকর্ষণীয় পুরস্কার গ্রহণ করেননি বরং এ নিয়ে বড়াই করেছিলেন বহুদিন। সোনাভাইয়ের পরিকল্পনায় সাজানো পারিবারিক পুনর্মিলনীর সর্বশেষ আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বারবিকিউ রাত। নাচে গানে আর খাওয়া দাওয়ার সে রাত ছিল উৎসবমুখর। বিশিষ্ট সংগীত ও নৃত্য শিল্পীদের নাচ গানের মধ্য দিয়ে ২০০৭ সনের পারিবারিক পুনর্মিলনী সমাপ্ত হল। আট ভাইবোনের মিলিত হ্বার এটাই ছিল সর্বশেষ পারিবারিক পুনর্মিলনী। তারপর রংবী আর ভাইয়া চলে যান তাদের গন্তব্যে। আমরা ফিরে আসি চিরচেলা নিজস্ব ভূবনে। গাজীপুরের স্মৃতিগুলো জীবন্ত হয়ে আছে আজও। ভিডিওতে সেসব দিনের ঘটনাগুলো দেখে হারিয়ে যাওয়া আনন্দের স্মৃতি মনে পড়ে বার বার। সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে ফেলেছি অনেক আপনজন, যারা আজ শুধু স্মৃতি।

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান শেষ হলেও মায়ের একটি বড় দায়িত্ব পালন তখনো বাকী ছিল। ছোটভাই কবীর অর্থাৎ আমাদের ছোট মামার দীর্ঘদিনের অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য আগে থেকেই মা অস্ত্রির ছিলেন। গাজীপুরে কিছু সময়ের জন্য ছোটভাইকে হাতের নাগালে পাওয়া গেলে তার চিকিৎসার জন্য মা কোন ছাড়

দিলেন না। ছোট ভাইয়ের চিকিৎসার অনীহার বিষয়টি আমলে না এনে মামুন ও মেজভাইয়াকে চিকিৎসার বন্দোবস্তের দায়িত্ব দিলেন। ছোট মামার হার্টের অপারেশন জরুরী বলে ডাক্তারদের পরিষ্কার অভিমতের কারণে এবার আর টালবাহানা করার সুযোগ পেলেন না ছোট ভাইটি। মে, ২০০৭ অপারেশনের তারিখ নির্ধারিত হয়। আমার মায়ের চলাফেরায় যথেষ্ট সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি অপারেশনের আগের দিন বারডেম হাসপাতালে মামাকে দেখতে গিয়েছিলেন। ঐ দিন ছোট মামাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। ছোট মামার সাথে একথা সেকথা বলে হাসপাতালে অনেক সময় কাটিয়েছিলেন মা। ছোট ভাইয়ের অপারেশনের জন্য রক্তের প্রয়োজন ছিল প্রচুর। আমার ড্রাইভার আবুল বাশার টিটুও ছিল এ রক্তের একজন যোগানদাতা। এ কারণে আমার মা এখনো টিটুর খোঁজ খবর নিতে ভোলেন না। নির্ধারিত দিনে ছোট মামার অপারেশন হয়ে গেল। এরপর শুধু অপেক্ষার প্রহর গোনা কবে মামা সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং ফিরে আসবেন আমাদের মাঝে। অপারেশনের দুই একদিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছোট মামাকে রিলিজও করে দেয়া হ'ল। রিলিজের পর ছোট মামা আমাদের মধ্যে কার বাসায় থাকবেন এ নিয়ে দেখা দিল আরেক বিপত্তি। মা আর ছোটমামা এ দু'জনারই সিড়ি দিয়ে ওঠা নামার সমস্যার কারণে তাদের জন্য এমন একটি বাসস্থান দরকার ছিল যেখানে সিড়ি দিয়ে ওঠানামার ধকল নেই। এ রকম বাসা শুধু একটিই ছিল। সেটি গাজীপুরে ছোট ছেলে কুটুর বাসা এবং ঐ বাসাটি ছোট মামার সবচেয়ে প্রিয় আবাস। অপারেশনের পর ঢাকার বিষাক্ত বাতাসের পরিবর্তে তিনি যদি গাজীপুরে থাকতে পারেন তাহলে সেখানকার নির্মল ও বিশুদ্ধ বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারলেই তার হার্ট সুস্থ হয়ে উঠবে এমন কথা ছোট মামার মুখে আমরা বহুবার শুনেছি। কিন্তু আমাদের ছোট ভাবীর যুক্তি ছিল হার্টের অপারেশনের পর বারডেমের কাছাকাছি কারো বাসায় মামার থাকাটা বেশী নিরাপদ। যে কোন মুহূর্তে সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া সহজ হবে। তাই মামাকে হাতিরপুলে মামুনদের বাসায় নেয়া হ'ল। তখন মঞ্জু খালাম্বা ঢাকায় থাকার সুবাদে তিনিই অসুস্থ মামাকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু মামা এ বাসায় থাকাকালীন সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে তিন তলায় উঠানো আর নামানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। ঢাকায় আমাদের কারো বাসাই একতলায় ছিল না। এরকম একটি সময়ে আমাদের বান্ধবী বকুলের বাসায়ও মামাকে একদিন রাখা হয়েছিল। আমার বেইলী রোডের সরকারী বাসার প্রতিবেশী মাসুদ ভাইয়ের দশ নম্বর বাসায় নীচতলার বাসাটি কিছুদিন ব্যবহারের জন্য আমি তার সাথে যোগাযোগ

করে মামাকে সেই বাসায় রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। এরকম একটি সময়ে মাসুদ ভাইয়ের এ সাহায্য কৃতজ্ঞতার সাথে আজও স্মরণ করি। ছোট মামাকে নিয়ে বেইলী রোডের সেই বাসায় প্রায় মাসখানেক ছিলাম। আমার মা সারাদিন মামার কাছে থাকতেন আর রাতে আমার বাসায় শুধু ঘুমানোর জন্য ফিরতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে মামার জন্য আমাদের সাধ্যমত সব কিছু করার পরেও মামা সুস্থ হয়ে উঠছিলেন না। তার কষ্ট আর যন্ত্রণার উপশম না হওয়ায় আমরাও চিন্তিত হয়ে পড়ছিলাম। মামার অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে একজন বোন তার ছোট ভাইটির সুস্থতার জন্য কতটা আকুল হয়ে উঠতে পারেন এর নজির আমরা দেখলাম এবং আমাদের উপলব্ধিতে তা স্থায়ী হয়ে থাকল। মামার সেবা যত্নের জন্য সীমাহীন পরিশ্রমে মা-ও দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলেন। অসুস্থ মামাকে ছেড়ে মা অন্য কোথাও একদণ্ড সময় কাটাননি। শিয়রে বসে দোয়া দরবন্দ পড়ে মামার রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন অবিরাম। মামার রোগের বাড়াবাড়ি আর কষ্টের সময়গুলোতে বারডেমে নিয়ে যাওয়া, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মেজভাইয়া আর মামুন দায়িত্ব পালন করেছেন। ছোট মামার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার থেকে শুরু করে মামার একমাত্র ছেলে ডনের সাথে লড়নে যোগাযোগ, আত্মীয় স্বজনকে মামার হোঁজখবর দেয়া ইত্যাদি কাজগুলো নিখুঁতভাবে করেছিলেন সোনাতাই। আমাদের বড় মামার পক্ষে ছোট ভাইকে দেখতে আসা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি নিজেই বহু দিন ধরে ডায়ালিসিসের মাধ্যমে অকার্যকর কিডনীর জন্য ব্যয়বহুল চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি বারডেম হাসপাতালে একবারই শুধু আসতে পেরেছিলেন অসুস্থ ছোট ভাইকে দেখতে। ব্লাড প্রেশারের একজন রোগী হিসেবে মায়ের পক্ষে ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক চাপ সহ্য করা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছিল। অসুস্থতার পুরো আড়াই মাস সময়ে ছোট মামার পাশে শুধুমাত্র মা আর আমরাই ছিলাম একমাত্র আপনজন। শিয়রে সন্তান কিংবা প্রিয়জনের প্রিয়মুখগুলো দেখার সৌভাগ্য হয়নি ছোট মামার। নিজের সন্তান সুদূর লড়ন থেকে শুধু টেলিফোনে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিল। ছোট মামা যে কতটা চাপা স্বভাবের ছিলেন তা বোঝা যেত তার কষ্টগুলো হজম করার দৈর্ঘ্য শক্তি দেখে। মনের গহীনে বাস করা লালায়িত ইচ্ছেগুলোকে তিনি মোটেই আঙ্কারা দেননি বেরিয়ে পড়ার জন্য। সব ইচ্ছা আর কষ্ট বুকে চেপে নিঃসাড় হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকার কিংবা অব্যক্ত কান্না লুকিয়ে রাখার দৃশ্যাবলী আজ বেগানা হয়ে আমাদের মনে আর্তনাদ করে। শুধুমাত্র মাকে এক মুহূর্তের জন্য দূরে

যেতে দেননি তিনি। মা দূরে গেলেই ‘বুয়া’ ডাকে অস্থির হয়ে উঠতেন। এসব যেন বোনের আঁচলের নীচে শৈশবের বড় হয়ে ওঠা সেই হারানো দিনগুলোর পুনরাবৃত্তি। তখনও তিনি ছিলেন একা ও অসুস্থ এবং এখনো তাই। বেইলী রোডের বাসায় আরো অনেক দিন কেটে গেল। কিন্তু মামার সুস্থতার লক্ষণ দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকল। গাজীপুরে ফিরে যাবার জন্য তিনি এবার সরাসরি তাগিদ দিতে থাকলেন। ছোট মামার জীবনের শেষ কয়টি দিন তিনি ফিরে পেলেন গাজীপুরের সবুজে ঘেরা শান্ত পরিবেশ, যেখানে নাম না জানা পাখির কুজনের অলস দুপুর আর নিষ্পাপ বাতাসের অফুরন্ট চলাচলের এ ছোট পৃথিবীতে আরো কিছু দিন বেঁচে থাকার জন্য তার মন হাহাকার করে উঠল। কিন্তু কোন কিছুই কবীর মামার অসুস্থ হার্টের সুস্থতার কারণ হ'ল না। মামা দিন দিন ফুরিয়ে আসতে থাকেন। ছোটমামার কষ্ট লাঘবের সব ব্যবস্থা সোনাভাই নিশ্চিত করেছিলেন। তার কলমের জন্য নতুন এসি, অক্সিজেন সিলিভারসহ আনুষঙ্গিক সব কিছুই ব্যবস্থা নেয়া হ'ল। সোনাভাই অক্ষণ হাতে অর্থ ব্যয় করলেন।

সারা দিন পরিশ্রমের পর মা যাতে রাতের বেলা ঘুমাতে পারেন সেজন্য মামাকে দেখাশুনার রাতের দায়িত্ব সোনাভাই নিজের কাছেই রাখলেন। মামার হাতের কলিং বেলটির শব্দ শুধুমাত্র সোনাভাই শুনতে পাবেন-এমন ব্যবস্থা করে তিনি দোতলায় ঘুমাতেন। রাতে বেলের শব্দ শোনামাত্র নীচতলায় ছুটে আসতেন এবং প্রয়োজনে সোনাভাই মামার শিয়রে বসেই রাত কাটিয়ে দিতেন। আমাদের অসুস্থ সময়গুলো এভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। সে রাতে সোনাভাই কলিংবেলের শব্দে নীচে এসে মামার অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন। রাত বাড়ার সাথে সাথে অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। সেদিনের রাতের আকাশও ছিল অশান্ত। প্রচণ্ড বাড়ো হাওয়া, মেঘের গর্জন ও বৃষ্টিতে সব কিছু তচ্ছন্দ হবার অবস্থা। রাস্তা ঘাট পানিতে ডুবে গেল। এদিকে মামার শারীরিক অবস্থা ঝুঁকির মধ্যে চলে যাচ্ছিল দেখে কালঙ্কেপণ না করে সেই বাড় বাদলের রাতে সোনাভাই একা মামাকে নিয়ে রওনা হলেন ঢাকার বারডেম হাসপাতালে। সেই বাড় বৃষ্টির রাতে নিজের জীবন বাজী রেখে অসুস্থ মামাকে নিয়ে সোনাভাই বারডেম হসপিটালে পৌছেছিলেন সম্ভবত রাত দুইটার দিকে। মামাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হ'ল। এরপর বৃষ্টি আর থামেনি। পরদিন আমরা আইসিইউতে অপেক্ষা করতে করতেই মামুন কেন জানি না হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। সংক্ষয় আমি আর মীনা মায়ের পাশে থাকা দরকার এ কথা ভেবে

গাজীপুরে চলে এলাম। মাগ'রীবের নামাজের পরে একটি ফোনকল আমাদের তিন ভাইবোনকে নিষ্ঠক ও নির্বাক করে দিয়ে জানিয়ে গেল মামা আর নেই। মা তখনো জায়নামাজে। সেদিন ছিল ১১ই জুন, ২০০৭ সন। মায়ের মানসিক দিকের কথা চিন্তা করে তৎক্ষণিকভাবে এ মৃত্যুর খবর মাকে গোপন করা হ'ল। মাকে শুধু জানানো হ'ল ছোট মামাকে লাইফ সাপোর্ট দেয়া হয়েছে। মামার মৃত্যুর সংবাদ ঘেনে নেবার জন্য মায়ের প্রস্তুতির প্রয়োজনটাই আমরা বড় করে দেখেছিলাম। কিন্তু সত্য প্রকাশিত হ'ল পরদিন ১২ই জুন। ভোরে মামার লাশ নিয়ে আসা হ'ল গাজীপুরে। আঞ্চীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সবাই মামাকে শেষ বিদায় জানালেন। শেষ বিদায় শেষে মামার লাশ নিয়ে লাশবাহী ট্রাকটি চলে গেল বুখাইনগর তার আপন ঠিকানায়। দীর্ঘ আনুমানিক ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পর ছোট মামাকে ফিরে যেতে হ'ল নিজ গ্রামে, শিকড়ের কাছে। বুখাইনগরে আমার নানার কবরের পাশে ছোট মামাকে চিরন্দিয়া শায়িত করা হয়েছিল। দুনিয়ার সব দুঃখ, কষ্ট ও যত্নগা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি শুমিয়ে গেলেন। এ শান্তির ঘূর্ম আর কোনদিন কারো ডাকে ভাঙবে না।

#### সাত.

সময় নিরবাধি চলতে থাকল। সময়ের থেমে থাকার সাধ্য কি। সময় কখনো পারে না ঘটে যাওয়া ঘটনার রূপ বদলে দিকে; ছোট মামার জীবনের সব ঘটনা ইতিহাস হয়ে সময়ের পাতায় লেখা হয়ে গেল। সময় সব ঘটনার সাক্ষী হয়ে থেকে গেল। বড় আপন আর কাছের দু'জন মানুষের দেহ ত্যাগ করে থাণ চলে গেল অজানায়। মামার স্মৃতি আঁকড়ে মা গাজীপুরে থাকলেন অনেক দিন। ছোট মামার মৃত্যুতে গাজীপুরের প্রতি আমাদের অদম্য আকর্ষণ যেন ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল। বিশেষ করে সোনাভাই এর পরিবারের উপর এ মৃত্যুর প্রভাব ছিল সুগভীর। কেউ ভুলতে পারছিল না ছোট মামার স্মৃতি বিজড়িত শেষ দিনগুলোর রক্তক্ষরণ। এমন আনন্দহীন বৈরী পরিবেশ থেকে রেহাই পেতে মাকে নিয়ে বরিশাল যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। মায়ের সুযোগ সুবিধার প্রতি সোনাভাই ছিলেন বিশেষভাবে যত্নবান। যাত্রাপথে কোন কিছুর ক্ষতি রাখলেন না তিনি। তবে সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য পাটুরিয়া ফেরীর পরিবর্তে মাওয়া হয়ে বরিশাল যাবার সুযোগ নিলেন তিনি। এর পিছনে কারণ ছিল পদ্মা নদীর মনোরম শোভা উপভোগ করা। নদীর প্রতি তার এ আকর্ষণ বহুকালের। বাংলাদেশের নদীগুলো প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। এ সব নদী বাংলাদেশের

শোভা। নদীগুলোর বিরামহীন বয়ে চলার সাথে তিনি জীবনের বয়ে চলার একটি মিল খুঁজে পেতেন। নদীমাত্রক এদেশের মানুষের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে নদী। নদীর উপর কংক্রিটের ব্রীজ তৈরী করে নদীর স্বাভাবিক গতি পরিবর্তন করে নদীগুলোর জীবন কেড়ে নেবার বিপক্ষে তার যুক্তি ছিল অকাট্য। কিন্তু সেদিনের নদী আমাদের জন্য হয়ে উঠেছিল ভয়াবহ। আমরা একটি রিজার্ভ ছোট ফেরীতে যাত্রা শুরু করার পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে শুরু হ'ল জীবন মরণ যুদ্ধ। সেই উত্তাল আর ভয়ংকর নদীতে খেলনার মত ফেরীটি দুলছিল। ফেরী কাত হওয়ার সাথে সাথেই মনে হচ্ছিল আমরা ডুবে যাচ্ছি। সেদিনের ফেরী যাত্রা জীবনে স্মরণীয় হয়ে রইল। মনে হল যেন আসন্ন মৃত্যু থেকে বেঁচে এলাম আমরা চারজন। যখন ফেরীটি নিরাপদে ঘাটে পৌছাল তখন আমাদের সহযাত্রী দুই একজন ঐ ভয়াবহ মুহূর্তে আমার মায়ের অভিব্যক্তির মূল্যায়ন করে বলেছিলেন, জীবন মরণের সেই কঠিন সময় মা ছিলেন শান্ত এবং ভয়হীন। একজন মা বিপদের মুহূর্তে তাঁর অভিব্যক্তি দিয়েই সন্তানদের সাহস যুগিয়েছিলেন। অচেনা সেই যাত্রীদের মন্তব্য চিরসত্য আমার মায়ের ক্ষেত্রে।

গাজীপুরের সেই চিরচেনা ‘অরুনিমা’ বাসাটির সব আনন্দ, উৎসব নিঃশেষ হয়ে গেল। সোনাভাই এর পরিবারের কারোই আর গাজীপুরে থাকার একবিন্দুও ইচ্ছে রইল না। এরকম এক অচল অবস্থায় ছোট মামার মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে ২২শে নভেম্বর, ২০০৭ সোনাভাই বিডিআর সদর দপ্তরে বদলীর আদেশ পান। তবে বিডিআর সদর দপ্তরে যোগদানের পর তাকে কিছুদিন জামালপুরে থাকতে হয়েছিল। জামালপুর থেকে তিনি সরাসরি পিলখানায় বিডিআর এর সদর দপ্তরে সিইএমই ইউনিটে যোগদান করেন। সোনাভাই এর মেজ ছেলে জিসান ঢাকা রাইফেল্স স্কুল থেকে এস,এস,সি পরীক্ষায় অংশ নেবে এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করেই ভাবী পিলখানায় সংসার শুরু করলেন। সোনাভাই এর ঢাকা বদলী হয়ে আসার খবরে আমরা দু’বোন সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত হলাম। কারণ শুধুমাত্র বদরপুরের উন্নয়ন কাজে নয় বরং বেড়াতে যাওয়া, শপিং করা কিংবা কোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য সোনাভাইকে আমরা আরো কাছে পাব, এই আনন্দে। সোনাভাই এর ঢাকা আসার সংবাদে ভাগ্নীরাও যেন আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। একটিই কারণ তা হল এ মামা তাদের সব আবদারই পূরণ করতে উদারহন্ত। তবে সোনাভাইয়ের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ভাবী দেখতেন

বিপরীতভাবে। তিনি স্বামীকে ‘বেহিসেবী’ হিসেবেই বিশেষিত করতেন। ভাবীর এই বিশেষণের সাথে আমরা ছিলাম একমত।

প্রিয় দুইজন মানুষের অভাববোধ মেনে নিয়েই আমরা সবাই দৈনন্দিন জীবনে অভ্যন্ত হয়ে যেতে থাকলাম। সেজভাইয়া ও ভাবীর তত্ত্বাবধানে মা বরিশালে তাঁর একঘেয়ে জীবন নতুন করে শুরু করার চেষ্টা করলেন। এই একঘেয়ে জীবনের মধ্যে বদরপুর ধামের কর্মকাণ্ড জীবনে বৈচিত্র্যের উৎস হয়ে দেখা দিল। ধামের ছেলে মেয়েদের সাথে যোগাযোগের মাত্রা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পেতে থাকল। আবার নামে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম আলী স্মৃতি যুব ক্লাবের ভিন্নধর্মী অঞ্চলিক নিয়ে আমাদের মধ্যেও নতুন প্রত্যাশা জন্ম নিতে থাকে। যুব ক্লাবের মাধ্যমে আবার স্বপ্নগুলো বাস্তবে রূপ নিতে থাকায় কাজের উৎসাহ বেড়ে যেতে লাগল। প্রতিবৎসর পালিত হতে থাকল ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৬ই ডিসেম্বর, ২৬শে মার্চ এসব জাতীয় দিসঙ্গলো। আমাদের ধামে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গরীব আর মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের ভাল ফলাফল অর্জনে উৎসাহদানের জন্য প্রতিবৎসর পুরস্কার হিসেবে বই দেবার যে নিয়ম আবার করে গিরেছিলেন, তাও এই ক্লাবের মাধ্যমে শুরু করা হ'ল। এছাড়া ক্লাবের পক্ষ থেকে ছেলেদের বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের অন্তর্মুখিতা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ তৈরী হল। গ্রামীণ উঠতি বয়সী ছেলেদের জন্য এ ধরনের সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করায় সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখার একটি ক্ষেত্র যেন অন্যায়ে তৈরী হয়ে গেল। এক্ষেত্রে মীনা, আমি আর সোনাভাই-ই সব কিছুতেই অংগীন ভূমিকা পালন করে আসছিলাম। তবে কিছু ক্ষেত্রে অপরিপক্ষ, অগভীর চিন্তাপ্রসূত কর্মসূচী নিয়ে আমরা লাগামহীন হতে থাকলাম। সব কিছুতেই তাৎক্ষণিক ফলাফল পেতে চাইতাম অথবা কখনো কখনো নিমিষেই অনেক বেহুদ বিষয় নিয়ে আমাদের মেতে ওঠার ক্ষেত্রগুলো স্ফীত হতে থাকল। এসব ক্ষেত্রে মায়ের সরস দিক নির্দেশনার কারণে আমরা ভবিষ্যতের অহেতুক ভোগান্তি থেকে অনেক ক্ষেত্রে রেহাই পেয়েছিলাম। মায়ের সুনিয়ন্ত্রণে কাজের পরিমাণের চেয়ে কাজের মান এর প্রতি বেশী মনোযোগী হয়েছিলাম। সত্যি আমাদের মা জয়ী, জয়ীশু। ছোটমামার মৃত্যুর পর এভাবে মাকে বিভিন্ন কাজের ভূবনে ডুবে থাকার সুযোগ দিয়ে মায়ের শোকের মাত্রাকেও সংযত করা গেল। প্রতি বৎসর আবার কবর জিয়ারতের মাধ্যমে ধামের সাথে সম্পর্ক আরো গভীর ও ঘনিষ্ঠ হতে থাকল।

২০০৮ সালেও আমরা ব্যস্ত বদরপুরের চলমান দু'একটি কর্মসূচী থেকে উৎসাহব্যঙ্গক সাড়া পেতে থাকলাম। আমাদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে বদরপুরে কিছু পরিবর্তন স্পষ্ট হতে লাগল। মৃধাবাড়ী থেকে আখন্দ বাড়ী পর্যন্ত পীচচালা রাস্তা হ'ল, বিদ্যুৎ লাইনের প্রবাহমান শক্তিতে পুরো এলাকাটি আলোকিত হয়ে উঠল। SOUL এর সাদা টাইলসের বিশাল খোলা জায়গায় প্রশিক্ষণপ্রাণ ছেলেমেয়েরা সেলাই এর উপকরণ নিয়ে ব্যস্ত -এমন সব দৃশ্য আমাদের নতুন করে শক্তি যোগাতে থাকল। মাকে বদরপুর গ্রামের এসব পরিবর্তন স্বচক্ষে দেখাবার আকুলতা আমাদের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মায়ের ঘোবনের দিনগুলোতে দেখা বদরপুরের ছোট ছোট খাল, নদীনালা, বনবাদাড় ঝোপঝাড় ইত্যাদি বদলে গিয়ে বদরপুর গ্রামের চেহারার পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে গ্রামের এঁটেল মাটির কর্দমাক্ত পায়ে চলা পথ, ছোটবড় খাল নালা ইত্যাদির উপর নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো পার হবার স্মৃতি মায়ের কাছে এখনো ভয়াবহ স্মৃতি। মায়ের সেই সব যাপিত স্বপ্নগুলোকে বদলে দিতে জীবনের গোধূলী লাগে তাকে বদরপুর নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করা হ'ল। আবার চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী ও কোরবানীর ঈদকে সামনে রেখে বদরপুর যাবার এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য অনেক প্রস্তুতির ধর্যোজন ছিল। আবার চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী ও কোরবানীর ঈদ এই দুটি অনুষ্ঠান গ্রামের বাড়ীতে আঞ্চীয় স্বজনের সাথে উদ্যাপনের এমন প্রস্তাবে মা-ও খুশী। বেশ উৎসব উৎসব আয়েজ তৈরী হল আমাদের সবার মাঝে। আবার জীবিতাবস্থায় কখনো এমনভাবে গ্রামে ঈদ করা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। তবে ইয়েং গ্রুপ তাদের নিজস্ব ভুবন ছেড়ে ডিসেম্বর মাসের কনকনে শীতে বদরপুর গ্রামে ঈদ করার মধ্যে কোন নতুনত্ব খুঁজে পেল না। তাদেরকে বিভিন্নভাবে উদ্ব�ৃদ্ধ করা হ'ল। হয়তো পরবর্তীতে জীবনে তাদের জন্য একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা হয়ে থাকবে আমাদের এই উদ্যোগ। আমাদের এ পরিকল্পনার পিছনে নিজ সন্তানদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও যোগাযোগ বাড়িয়ে দেবার একটি প্রচলন ইচ্ছা কাজ করছিল। তাছাড়া সন্তানদের মধ্যে গ্রামীণ জীবনে এ ধরনের ধর্মীয় উৎসব পালনের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেয়ার বিষয়টিও আমাদের ভাবনায় ছিল। এ প্রসঙ্গে বদরপুর গ্রামের কিছু একান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বলে রাখি। এ গ্রামে শিক্ষিত লোকজনের সংখ্যা হাতে গোনা। তারাও ধাম ছেড়ে নগর জীবনে অভ্যন্ত হয়ে যাওয়ায় গ্রামের উন্নতির জন্য তাদের তেমন অবদানের উদাহরণ নেই। বাইরের জগত সম্পর্কে নির্লিঙ্গ মনোভাব নিয়ে নিজস্ব ধ্যান ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে ভালবাসে

গ্রামবাসী। আশেপাশের এলাকাগুলো বিভিন্ন দিক থেকে উন্নত হতে থাকলেও এর কোন প্রতিফলন এ গ্রামে দেখা যায়নি বহুযুগ।

বরিশাল হয়ে বদরপুর যাওয়ার অর্থ এক দীর্ঘ ভ্রমণের ব্যাপার। সবার পরিবারের সদস্য নিয়ে এ ভ্রমণে কমপক্ষে বিশ থেকে পঁচিশ জনের আসা যাওয়া ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করার মত বিরাট দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে। বরাবরের মত সোনাভাইয়ের বাসায় আমরা সবাই একত্রিত হয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনায় বসলাম। আলোচনার শুরুতেই একটি চমকপ্রদ প্রস্তাৱ দিয়ে সোনাভাই সবার বিশেষ করে ইয়ং গ্রল্পের মধ্যে হৈচে ফেলে দিলেন। তিনি বিশ পঁচিশের টিমকে স্পীডবোটে বরিশাল পর্যন্ত ভ্রমণের অফার দিলেন। তার প্রস্তাবে প্রথমে অনিচ্ছ্যতার ভয়ে ‘না’ এর দলে আমরা বড়ো আৱ ইয়ং জেনারেশন ‘হা’ এর দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। ভাগে ভাগ্নিৱান্দার জেনারেশন ‘হা’ এর দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। ভাগে ভাগ্নিৱান্দার জেনারেশন ‘হা’ এর দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। সোনাভাই হতাশ হলেও মেনে নিলেন ভাবীর মতামত। পরে ঢাকার শাহীবাগ যাদুঘরের সামনে থেকে একটি বাসে আমরা সবাই ঢাকা থেকে বরিশাল যাত্রা শুরু করেছিলাম। বরিশাল থেকে বদরপুর যাবার ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গে মায়ের শারীরিক অবস্থা আমাদের সবার বিবেচনায় অগাধিকার পেল। ছোট মাঝার অসুস্থকালীন সময়ে মায়ের অস্থাভাবিক পরিণামের কারণে তাঁৰ ওজন অনেক কমে গিয়েছিল। মানসিক দিক থেকেও মা তখন পর্যন্ত পুরেপুরি শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মায়ের মন ও শরীর এই দু'য়ের সুস্থতা নিশ্চিত করেই আমাদের বদরপুরে যাবার ভাবনা ভাবতে হয়েছিল। মেজভাইয়া অর্থাৎ ডাক্তার ছেলে সাথে থাকায় মা বদরপুর যাবার সাহস যোগাতে লাগলেন। আবার বদরপুরের পীচালা রাস্তা, ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো, SOUL এর কার্যক্রম ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখা আৱ সেই সাথে পঞ্চাশ বৎসর আগেৱ দেখা বদরপুর গ্রামেৱ চিৰ বৰ্তমানেৱ সাথে মিলিয়ে দেখবার অদ্য ইচ্ছা মাকে প্রলুক্ত করেছিল। তখন ডিসেম্বৰ মাস। কনকনে শীত। গ্রামেৱ শীত যেন শহৰেৱ তুলনায় আৱো বেশী শৰীৱে জেঁকে বসে। সবদিক থেকে যতখানি নিৱাপত্তাৱ ব্যবস্থা নেয়া সন্তু তা নেয়া হ'ল। যাত্রা পথে বিভিন্ন ধৰনেৱ মুখৰোচক ও লোভনীয় খাবার দেখে সবাই উসখুস কৱছিল। কিন্তু মেজভাইয়াৱ ভয়ে কেউ সেসব খাদ্য খাবার ইচ্ছা

প্রকাশের সাহসও দেখাতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সোনাভাই এ বিপদ থেকে রক্ষা করলেন ভাগ্নিদের। তার অকাট্য যুক্তির কাছে কোন বাঁধাই রইল না ফেরী ঘাট থেকে সবেদা, বরই, পেয়ারা, ডাবের পানি, চিড়ামুড়ি, ভাপা পিঠা ইত্যাদি কিনে সবার মধ্যে বিতরণ করার কাজটিতে। সোনাভাই এর সাথে ভ্রমণের আনন্দই আলাদা। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর ফেরী যাত্রায়ও সোনাভাই আমাদের পদ্মা নদীর টাটকা ভাজা ইলিশ মাছ খাবার সাধ পূরণ করেছিলেন।

দুই ঘন্টা যাত্রা শেষে আমাদের বাহিনী শেষ পর্যন্ত বদরপুরের আয়েশা মঞ্জিলে পৌছে গেল। রাতে কনকনে শীতে যখন কাঁপাকাঁপি অবস্থা তখন নাজমুস শায়াদাং লেপ, তোষক, কম্বল ও বালিশের ব্যাপক সরবরাহ করে আমাদের শীতের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এ প্রসঙ্গে নাজমুস শায়াদাং এর কথা কিছু না বললেই নয়। আমাদের বড় চাচার বড় ছেলের মেজ ছেলে নাজমুস শায়াদাং সকল কাজের কাজি। SOUL ও শুব ঝাব নির্মাণে তার একক অবদান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন কাজের জন্য সরকারী ও বেসরকারী অফিসগুলোতে আসা- যাওয়া করতে করতে এখন তার দক্ষতা অন্য সবার চাইতে বেশী। কাজে কর্মে তার মধ্যে কখনো অনীহা কিংবা অলসতা দেখা যায়নি। এ যাত্রায়ও নাজমুস শায়াদাং এর ব্যবস্থাপনায় বদরপুরের সকল অনুষ্ঠান যথাসময়ে এবং ক্রিটিমুক্তভাবে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

পরের দিন কোরবানীর ঈদ উদ্যাপনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকলাম আমরা। সোনাভাই রাতেই ঈদের নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করার সকল প্রস্তুতি মাথায় রেখে ছেলেদেরকে ঘুমাতে যাবার কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশের উদ্দেশ্য দুটি। এক. নতুন পরিবেশে ঈদের নামাজ আদায় এবং দুই. ধার্মীণ আত্মীয় স্বজন, বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে পরিচয় এবং উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার একটি পদক্ষেপ। নগর জীবনের কৃত্রিমতা থেকে বেরিয়ে এসে গ্রামকে ভালবাসা এবং সেই সাথে শিকড়ের সাথে পরিচয় ঘটানোর জন্যই এ উদ্দেশ্য। নাড়ির সাথে সম্পর্কহীন জীবন অসার জীবনের নামাত্ম- সোনাভাই এর এ ধরনের দার্শনিক কথাবার্তা ইয়েহের প্রতিপাদ্য তেমন গায়ে মাখল না। তবে খুব ভোরবেলা রাজধানী ঢাকায় বসবাসে অভ্যন্তর ভাগ্নেরা ঠাড়া পানিতে গোসল করে ঠিক ঠিক ঈদগাহে হাজির হয়েছিল। সেদিনের সেই কষ্ট হয়তো তাদের পরবর্তী জীবনে আনন্দের কোন স্মৃতি হয়ে থাকবে। ঈদের পরের দিন মধ্যহুক ভোজনের জন্য ধার্মের নিকট আত্মীয় স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী,

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এ আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে মা ছিলেন ভীষণ সতর্ক। কারণ তিনি এ বাড়ির লোকজনদের আস্থাসম্মানের বিষয়ে ছিলেন পুরোমাত্রায় সচেতন। তাই দাওয়াত পৌছানোর কাজটি যাতে নির্ভুল হয় সেজন্য তিনি আমাদের আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সোনাভাই এই দায়িত্বটি নিজে পালন করে মাকে নিশ্চিন্ত করেছিলেন। তিনি মৃধা ও আখন্দ বাড়ীর আঞ্চীয় অনাঞ্চীয় সবাইকে তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিজে দাওয়াত দিয়েছিলেন। এরপর দুপুর বেলা মৃধাবাড়ীর শত বৎসরে পুরানো মসজিদের সামনের খোলা জায়গায় প্যান্ডেল করে দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। আমন্ত্রিত মেহমানদের খাবার পরিবেশনের দায়িত্বে ছিলাম আমরা ছয় ভাইবোন। ঐ দিন আবার জন্য মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যুব ঝাবের ভিত্তি প্রস্তর মায়ের হাতে স্থাপন করা হল ঐ দিনই। বদরপুর গ্রামের পরিবর্তনের দৃশ্যগুলো স্বচক্ষে দেখার মাধ্যমে মায়ের বিগত ফেলে আসা জীবনের বিস্তর কঠের আংশিক পরিসমাপ্তি ঘটবে, এই ছিল আমাদের সবার কামনা। মাকে কখনো বস্তুগত লাভ লোকসানের হিসেব করতে দেখিনি কিংবা আফসোস এর কোন শব্দও তিনি কখনোই উচ্চারণ করেননি। অতি অল্পে তুষ্ট তিনি একজন অনন্য মা। তাঁর নির্মল হাসি চাঁদের আলোর মত অপূর্ব। মায়ের এই আঞ্চকথা তাঁর অভীত জীবন, প্রিয় মানুষ, সখ, ইচ্ছা অনিছ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি তাঁর সন্তানদের বড় হয়ে ওঠার ঘটনাপ্রবাহের রচনায় পরিণত হয়ে গেল।

বদরপুরে আবার মৃত্যুবার্ষিকী ও ঈদ উদ্যাপনের পর্ব শেষ করে বরিশাল এসেই ঢাকা ফেরার তাড়ায় সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সোনাভাই এর পরিবারের সবাই ঢাকা চলে গেলেও সোনাভাই বরিশালে রয়ে গেলেন আরো একদিনের জন্য। এসময়ে তিনি খালাত বোন কান্তার বাসার আমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। এছাড়া বহুদিন পর আমার শ্বশুরবাড়ী আমীর কুটিরের ঈদোভর অনুষ্ঠানে গিয়ে বহুদিনের অদেখা স্বজনের সাথে দেখা করলেন। এরপর বাকী থাকল আরও একটি জরুরী কাজ। এ কাজটি হল মাকে নিয়ে বুখাইনগরে ছোট মামার কবর জিয়ারত করা। মা ছোট মামার কবর জিয়ারতের জন্য বহু আগে থেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত সঙ্গী না পাওয়ায় মায়ের বুখাইনগর যাবার ইচ্ছাপূরণ হচ্ছিল না। কোথাও যাবার সময়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গী হিসেবে পেতে এবং তাদের উপরই বেশী নির্ভর করতেন

মা। বছদিন পরে ছোট ছেলের সাথে বুখাইনগরে যাবার সুযোগ পেয়ে মা, আমি, বেবী ও মায়ের আরো দুই ভাইয়ের পরিবার তৈরী হলাম। পনের জনের একটি দল রওনা হয়েছিলাম বুখাইনগর। কীর্তনখোলা নদীর মৃদুমন্দ হাওয়ায় বছদিন পরে নানা বাড়ী বুখাইনগর এসে পৌছালাম। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিংবা পরে বুখাইনগরের সাথে এখনকার বুখাইনগরের অনেক পার্থক্য দৃশ্যমান হ'ল। কৈশোরের সেই আনন্দঘন মুহূর্তের অনুভূতিগুলো বদলে গেল মুহূর্তেই। বুখাইনগরে পৌছে খোন্দকার বাড়ী ঢোকার মুখেই চোখে পড়ে যায় সেই নদীটি। সেই প্রবাহমান নদীটি শুকিয়ে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় বয়ে চলেছে। সেই এক টুকরো ছোট সবুজ মাঠের কোন নিশানাই নেই। সে জায়গাটি ভরে আছে কাঁটাগুলো আর ঝোপঝাড়ে। নদীর পাশে পায়ে চলা মাটির পথটি আরো সংকীর্ণ হয়ে গেছে। সেই পথের ঠিক পাশেই ঘূমিয়ে আছেন ছোট মামা। মামার কবরের পশ্চিম দিকে শায়িত আমাদের নানা। ঢোকের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে খোন্দকার বাড়ীর সেই জমজাট দিলগুলোর দৃশ্যাবলী। আজ কোন কিছু আর তেমনটি নেই। নিজীব, আণহীন আর শোভাহীন এক কিংবদন্তীর সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা বর্তমান থেকে উঠে আসা নস্টালজিক কিছু মানুষ। ছোট মামার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম মা কাঁদছেন নিঃশব্দে। নীরব, ছিমছাম ধামের সেই পরিবেশে মনের গহীনে হাজার বছরের জমাট কান্নার বাঁধ ভঙ্গে যাচ্ছিল। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা মাকে ফিরিয়ে নিলাম তাঁর কৈশোর থেকে যৌবনের সময়গুলোতে। একদা এ ধামের সব কিছুতেই যিশে ছিলেন তিনি। দাদী, বাবা, মা, চাচা, চাচীর আদরে আর সমবয়সী খেলার সাথীদের সাথে চপ্পল, উচ্চল সময় কেটেছিল। এতদিন পরে ফিরে এসেছেন নিজ ধামে প্রৌঢ়ত্বের বেশে। এর মাঝে হারিয়ে গেছে অনেক সময় আর কত প্রিয়জন। প্রিয়জনদের হারাবার বেদনায় মা কাঁদছিলেন। কান্নার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল তার ছোট ছোট তিনটি ভাইবোনকে লালন পালনের খন্দ খন্দ স্মৃতি। নিজের সব আনন্দ, স্বপ্ন, সখকে বিসর্জন দিয়ে তিন ভাই বোনকে প্রতিষ্ঠিত করতে কত না দুর্ভোগ, কষ্ট স্থীকার করেছিলেন তিনি। আজ প্রিয়জনদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল ছোট মামার জীবনের দুর্ভোগ আর কষ্টের সব কিছুই যেন মায়ের জীবনের দুর্ভোগে পরিগত হয়ে গেল। ভালবাসার তীব্র অভাববোধ নিয়েই ছোট মামা চলে গেলেন পরগারে। ছোট মামার জীবনের স্মৃতিচারণের কষ্ট বুকে পুষেই মায়ের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করতে হবে। মূল বাড়ীতে মুরব্বী স্থানীয় এখন আর কেউ বেঁচে নেই। আমরা ছোট মামার জন্য দোয়া ও মিলাদে অংশ নিয়ে মায়ের মেজ

চাচার বাড়ীতে দুপুরের খাবার খেয়ে ফিরে এলাম কীর্তনখোলা নদী তীরে, যে তীরে আঁচড়ে পড়া হাজার টেউমের কান্নার শব্দ কেউ শুনতে পায় না। একদিন খোন্দকার বাড়ীর আভিজাত্য বিলীন হয়ে যাবে সময়ের বিবর্তনে। আমাদেরও হয়তো আর ফেরা হবে না এ পথে এ জীবনে।

বরিশাল থেকে ঢাকা ফেরার ঠিক আগে ঘটল আরেক কান্ড। খুব ভোরে মালক্ষ্য করলেন তাঁর ছোট ছেলেটি বাসায় নেই। ছুটছাট করে কোথায় কিছুক্ষণের জন্য চলে যাওয়া আর ফিরে এসে মনগড়া কোন অবাস্তব ঘটনার জলজ্যান্ত বর্ণনায় কতটা পারঙ্গম তার এই ছোট ছেলেটি তা কারো অজানা নয়। তাকে বাসায় না দেখে আমরা সবাই এরকমই কিছু একটা অনুমান করছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরলেন তিনি, সাথে নিয়ে মাছের ছোটখাট একটি আড়ত। তখন ঢাকা রওনা দেবার জন্য তার হাতে ছিল খুব কম সময়। ঢাকা যাবার ঠিক আগে এত মাছ কেনায় মা ও বাসার সবাই হতভব। কিন্তু ছোট ছেলেটির মনকাড়া হাসিতে কারো মুখে আর কোন কথা ঘোগাল না। তাড়াহৃতার মধ্যেও ছোট ছেলের জন্য প্রিয় কিছু মাছ ফ্রাই করে সামনে এনে রাখলেন মা। পরম তৃষ্ণিতে গরম গরম ফ্রাই করা মাছ খেয়ে চললেন আর মা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। বাকী মাছ ফ্রিজে রেখে মাকে খাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েই দুপুর একটায় সোনাভাই বেবীর দুই মেয়ে আর মুনির মামাকে নিয়ে ঢাকার পথে রওনা হয়ে গেলেন। ঈদের সময়ে মাওয়ায় ফেরীঘাটে অস্বাভাবিক জ্যাম থাকায় আরিচার পথ ধরেছিলেন তিনি। সেখানেও জ্যাম। জ্যামে বসে সময় নষ্ট করার তর সহিছিল না। নতুন বুদ্ধি খেলে যায় তার মাথায়। মনে পড়ে যায় জাহানুর খালার কথা। তিনি জাহানুর খালাকে দেখার জন্য যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন। গাড়ী মুরিয়ে ফরিদপুর, রাজবাড়ীর পাংশা গিয়ে ঠিকানা খুঁজে বের করতে তাদের বহু সময় লেগে যায়। তবুও জাহানুর খালাকে এক নজর দেখা চাই-ই-চাই। শেষ পর্যন্ত জাহানুর খালার সাথে মাত্র আধা ঘন্টার মৌলাকাত শেষে আবার পথ চলা শুরু করেন। সারারাত গাড়ী চালিয়ে বাংলাদেশের মোটামুটি সব জেলা কভার করে ভোর রাতে সোনাভাই ঢাকা পৌছেছিলেন। সেবারের লম্বা ভ্রমণের ধকলে বেবী ও তার দুই মেয়ে প্রায় তিন চার দিন অসুস্থ থাকে। সে স্মৃতি তারা এ জীবনে ভুলতে পারবে না।

ঢাকায় আমাদের একদেয়ে জীবন শুরু হতে না হতেই আবার একটি অপ্রত্যাশিত খবরে সবাই আবার স্নায়বিক দৌর্বল্যের শিকার হ'ল। তবে এ

গরম খবরের উৎস এবার আর সোনাভাইও নন। বরং তার বড় ছেলে তারিক-বিন-আজম তানিম। বর্তমানে স্ট্যার্টাড চার্টার ব্যাংকের কর্মরত এক উদীয়মান ব্যাংকার। হঠাৎ করেই তানিমের বিয়ের সংবাদে আমরা হতভম। মাত্র বিবিএ পাশ করে এমবিএ পড়াশুনার জন্য কানাডায় বড় চাচার সাথে যোগাযোগে ব্যস্ত তানিমের এ সময় বিয়ের খবরটা যেন বাতাসের আগে সব জায়গায় পৌছে গেল। পাত্রী সুমাইয়া, একটি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। পাত্রীর বাবা লেফটেন্যান্ট কর্ণেল, সোনাভাই এর বন্ধুবিশেষ। তানিম ও সুমাইয়ার পড়াশুনার মাঝপথে এ বিয়ের কথাবার্তায় কেউ-ই প্রস্তুত ছিল না। একটা বিভাস্তিক পরিস্থিতি। তাই বিয়ের খবরটা সোনাভাই প্রথমেই মাকে জানিয়েছিলেন। যে কোন ক্রাইসিসে প্রথমেই আমরা সবাই মাকে স্মরণ করি। এ আমাদের স্বভাবজাত। কারণ মায়ের সাথে যে কোন বিষয় আলাপ করার সাথে সাথে আমরা একটি সঠিক ও সুন্দর সমাধান পেয়ে যাই। মায়ের মতামত বা পরামর্শ শুনে মনে হয় এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ মতামত বা পরামর্শ। তানিমের বিয়ের ক্ষেত্রেও সোনাভাই মায়ের সাথে টেলিফোনে কথা বলার পরই ওদের বিয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তানিমের বিয়ের তারিখ ঠিক হল ৪ঠা এপ্রিল, ২০০৯। মেজ ছেলে জিসান এর এস,এস,সি পরীক্ষার কারণে একটু সময় নিয়েই বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। তানিম এ পরিবারের প্রথম সন্তান। তাই তার বিয়ে উপলক্ষে বিশেষ আনন্দ উৎসব হবে এবং এ উৎসবে নিকট ও দূরের সবাই শরিক হবেন এমন একটি ধারণা পোষণ করা অতিরিক্ত কিছু নয়। বিয়ের কার্ড ছাপানোও শেষ। ভেনু ঢাকার পিলখানায় বিডিআর “দরবার হল”। গয়নাগাটির অর্ডার হয়ে গেছে। সব আয়োজন সমাপ্ত। এখন শুধু জিসানের পরীক্ষা শেষ হবার অপেক্ষায় সমস্ত পরিবার, আজীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব। এমন কি বদরপুর ধামেও পৌছে গেল সংবাদ। সেখানেও সাজ সাজ রব। একটাই কথা “কর্ণেল স্যারের ছেলের বিয়ে”। তানিমের বিয়ের আয়োজন চলাকালীন সময়ে মামাত বোন সিনথিয়ার বিয়ের প্রস্তাবও চূড়ান্ত হ'ল। আবু মামা যখন অস্ট্রেলিয়ায় পি,এইচ,ডি করেন তখন সিনথিয়ার জন্ম সেই দেশে। জন্মস্থলে সে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। পাত্র বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের একজন সদস্য। এ বিয়ের বেশ কিছু দায়িত্বার সোনাভাইকে কাঁধে নিতে হ'ল। আবু মামা অসুস্থ থাকার কারণে তাঁর বড় মেয়ে নেলীর স্বামী জি,এম,মোশারফ হোসেন (খোকা) এবং সোনাভাই এই দুজনে এ বিয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারেই একই সাথে কাজ করে মামা ও মাঝীকে নিচিন্ত করেছিলেন। মেয়ে পক্ষের অনুষ্ঠানটি বিডিআর এর রাইপকস্ এ

হয়েছিল। মাঝীর হাঁটাচলার অসুবিধার কারণে সোনাভাই তার বসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করায় মাঝী তার এ ভাগের তারিফে পঞ্চমুখ। সিনথিয়ার বিয়ের উপহার কিনতে বরাবরের মত তিনি ভাই বোন রঞ্জনী মেলায় গিয়েছিলাম। রঞ্জনী মেলা থেকে ফেরার পথে সোনাভাই এর সাথে ধানমন্ডিতে রাতের ডিনার হিসেবে চাইনিজও খাওয়া হ'ল। চাইনিজ থেকে বাদ গেলেন না গাঢ়ীর দুই বিডিআর সদস্যও। সেদিন তারা ড্রাইভার হিসেবে ডিউটিতে ছিলেন। সোনাভাই ডিউটির বিডিআর সদস্যদের ভালবাসতে জানতেন। সিনথিয়ার বউভাতের অনুষ্ঠান ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯। ঐ দিনের অনুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। সেদিন সোনাভাই ছিলেন ভীষণ শান্ত ও মৌরব। সোনাভাই এর এ রূপ আগে কখনো দেখিনি।

আবু আর ছোট মাঝার মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন একটা কষ্টের সময় পার করছিলাম আমরা। তানিমের বিয়ের খবরটি আমাদের সেই সময়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল। তানিমের বিয়ে উপলক্ষে মায়ের ঢাকা আসার বিষয়টি নিয়ে সোনাভাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ছোট ছেলের ঘরের সবার বড় ছেলে মায়ের বড় নাতি তানিম। তানিমের বিয়েতে মাকে ঢাকা আসতে হবে কি হবেনা এ প্রশ্নই অবাস্তর। মায়ের ঢাকা আসার প্রতিটি মুহূর্ত যাতে নির্বিচ্ছিন্ন ও আরামদায়ক হয় সেসব চিন্তায় ছোট ছেলে বরং বেশী আচ্ছন্ন ছিলেন। এ নিয়ে মায়ের সাথে তার টেলিফোনে বার কয়েক কথা হয়েছিল। মা তাঁর ছোট ছেলের প্রশ্নের উত্তরে ঢাকা আসার বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলেননি বলেই জানা গেছে। আমরাও যখন মাকে তানিমের বিয়ে উপলক্ষে ঢাকা আসার জন্য টেলিফোনে তাঁর মতামত জানতে চাইতাম, এ বিষয়ে তেমন স্পষ্ট কোন জবাব মা দেননি বলেই মনে পড়ে। সম্ভবত বিয়ের দিনক্ষণের দূরব্দের কথা ভেবে এত আগে ভাগেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না মা। সোনাভাই মাকে শুধু বার বার বলেছিলেন- “তানিমের বিয়ে আপনি দেখবেন না তো আর কে দেখবেন”। সোনাভাই এর এ কথার অর্থ ছিল এরকমই যে মায়ের বয়স প্রায় চুয়ান্তর বৎসর হয়ে যাওয়ায় এবং অন্যান্য নাতি নাত্নীদের বিয়ের বয়স ও সময় পরিপক্ষ হতে আরো অনেক সময় লাগবে-এ কারণে বিয়ের জন্য পরিপক্ষ একমাত্র নাতি তানিমের বিয়ে দেখার ভাগ্যই শুধু মায়ের হবে। কাজেই এ বিয়েতে মাকে থাকতেই হবে। পরে মাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম তিনি মনে মনে ঢাকা আসার সিদ্ধান্ত নিলেও তা অজানা কোন কারণে কখনোই সরাসরি মুখে উচ্চারণ করেননি।

বিয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য সোনাভাই ও ভাবীর ব্যস্ততাও বেড়ে যেতে থাকে। বিডিআর সঙ্গাহ উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর কারণে সোনাভাই এর অফিসের কাজের চাপও সেসব দিনগুলোতে যেন বেড়েই চলছিল। আমরা আমাদের আনন্দের প্রকাশ ঘটাতে পারছিলাম না শুধুমাত্র জিসান এর পরীক্ষা নির্বিবাদে শেষ হোক-এই প্রতীক্ষায়। তবে টেলিফোনে নতুন বউ সম্পর্কে কৌতুহল নির্বত্তির জন্য হরদম কথাবার্তা চলছিল। এরকম একটি সময়ে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ রোজ বুধবার দিন। ঠিক অন্যান্য দিনের মতই ছিল সে দিনটা। শীতের হালকা পরশ তখনও শেষ হয়নি। আমরা যে যার অফিসে কর্মব্যস্ত দিন শুরু করেছি মাত্র। কোথাও কোন ছন্দপতন নেই, একেবারেই সাধারণ এবং নির্মল সকাল। পিলখানার বিডিআর সদর দপ্তরের সকালটিও এর ব্যতিক্রম ছিল না। প্রতিদিনের মত সেদিনের সেই নির্বোধ সকালেও মায়ের ছেট ছেলে শামসুল আজম প্রাতঃকালীন হাঁটার কাজটি সেরে নিয়েছিলেন তার প্রতিদিনের সঙ্গীদের সাথে। সেদিন সকাল বেলা দরবার হলে অনুষ্ঠিত হবে দরবার। ভোরবেলা সোনাভাই নাস্তা করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। ফিরে এলেন কোমরের বেল্টটি বাঁধার জন্য। তানিম সাভারে। বিডিআর এর “উপল” বাসায় শুধু ভাবী, জিসান আর দীপ। কাজের মেয়ে মুক্তা রান্না ঘরে ব্যস্ত। হঠাৎ প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দ। প্রচন্ড শব্দ আরো প্রচন্ড হতে থাকে। বেলা গড়িয়ে চলে। দরবার হলে অনুষ্ঠানে বসা সোনাভাইয়ের সাথে কথা হ'ল মোবাইলে। একবার, দুইবার, হয়তোবা তিনবার। একটি বাক্য “তোমরা সাবধানে থেকো”। মীনার সাথে কথা হ'ল দশটার দিকে “আমরা গোলাগুলির মধ্যে আছি”। বিদ্রোহ করেছে বিডিআর জোয়ানরা। দরবার হলে দরবারে বসা সব আর্মি অফিসারদের নিরস্ত্র অবস্থায় গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে। অফিসারদের বাসাবাড়ীতে টহুল দিচ্ছে বিডিআর সদস্যরা, লুটপাট করে নিচ্ছে সব কিছু। আগনের লেলিহান শিখা আর ধোঁয়ায় পুরো এলাকা অঙ্ককারে ডুবে যাচ্ছে, এসব খবর বারঞ্জের মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা ঢাকাময়। সারা বাংলাদেশের চোখ তখন টেলিভিশনের পর্দায়। খবরের শেষ নেই, কথার শেষ নেই। বুধবার শেষ হয়ে বৃহস্পতিবার এল। বিডিআর এর গেটে হাজার মানুষের চল নেমে এল প্রিয়জনকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাবার আশায়। আমরা অপেক্ষারত সোনাভাইয়ের জন্য। অপেক্ষা শুধু বিডিআর এর গেট থেকে সোনাভাই বেরিয়ে আসছেন -এ দৃশ্য দেখার। ভাবীর সাথে পঁচিশে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ সন্ধ্যা পর্যন্ত টেলিফোনে আমার সাথে যোগাযোগ ছিল। তারপর তাও নেই। ভাবীকে ও দুই ছেলেকে পাওয়া গেল বৃহস্পতিবার। এরপর সবাই

একত্রিত হলাম মীনার বাসায় সোবহানবাগে। সোনাভাই আর বিডিআর এর গেট থেকে অক্ষত নয়, ক্ষত নিয়েও বেরিয়ে এলেন না। সোনাভাইকে অক্ষত অবস্থায় পাবার অপেক্ষা সাঙ্গ হ'ল। এবার অপেক্ষা অন্য কোন সংবাদের জন্য। বৃহস্পতিবারও কোন খবর নেই। একটি স্বষ্টিকর খবর জানার জন্য কতজন কতবার টেলিফোন করেছে-তার কোন ইয়ত্তা নেই। বিনু আপা, আমার ননাস বার বার টেলিফোনে খবর জানার জন্য কেমন উত্তলা হয়ে পড়েছিলেন। বন্দু ও পাট মন্ত্রণালয়ের আমার পিও সিরাজুল ইসলাম মোল্লার একটি ভাল খবর জানার উদগ্র ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশের ছবিখানা আজও চোখে ভাসে। বিডিআর এর গেটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে এলাম রিক্ত হাতে। এবার আরো কঠিন বাস্তবতার মুখ্যমুখ্য আমরা। সোনাভাইয়ের প্রাণহীন দেহখানি কি পাব? শুক্রবার অনেক লাশের ভিতরেও সোনাভাইয়ের প্রাণহীন দেহখানি নেই। মনে আশার আলো জ্বলে ভাবলাম, এত উপস্থিত বুদ্ধি যার তিনি তো বেঘোরে প্রাণ দেবেন না। হয়তো পালিয়ে বেঁচে আছে কোথায় সবার অলঙ্কা। আবার অপেক্ষা। তবে হাসপাতালে স্তুপীকৃত লাশের মাঝে খুঁজতে থাকার বিরাম নেই। ভাবী, ভানিয়, মেজভাইয়া, দুলাভাই, নাজমুস শায়াদাং সবাই মরিয়া সোনাভাইকে খুঁজে পেতে। শেষ পর্যন্ত শনিবার সোবহানবাগে একটি টেলিফোন এল। ফোনে তানিমের কষ্ট - “ফুফু বাবাকে পাওয়া গেছে”। চিৎকার করে জানতে চাইলাম “কিভাবে পেয়েছি”। উত্তরে শুধু কান্না আর একটি কথা- “বাবার লাশ পেয়েছি”। আমরা পেলাম ভাইয়ের লাশ হয়ে যাবার খবর। এর পরের কাহিনী জানে সারা বিশ্ব, জানে সারা বাংলাদেশ। জানে সন্তানহারা মা, স্বামীহারা স্ত্রী, পিতাহারা সন্তানেরা, ভাইহারা ভাইবোনেরা- এ জানার ভাষা গান হয়ে কানে বাজে অর্হনিশি,

আজও কানে ভাসে সেই কথাগুলো  
কে জানে হবে যে শেষ কথা।  
নিয়তির ডাকে দিয়ে যে সাড়া,  
ফেলে গেল শুধু নীরবতা  
যার চলে যায় সে বোঝে হায়,  
বিচ্ছেদে কী যন্ত্রণা!  
অবুব শিশুর অবুব থশু,  
কী দিয়ে দিব সাঞ্চনা  
আমি চিৎকার করে কাঁদিতে চাহিয়া

করিতে পারি না চি�ৎকার।  
 বিধাতা তোমায় ডাকে বারে বারে  
     কর তুমি মোরে মার্জনা  
     দৃঢ়খ সইতে দাও গো শক্তি  
     তোমার সকাশে প্রার্থনা  
     চাহি না সইতে আমার মাটিতে  
     মজলুমের আর্তনাদ  
     বিষাদ অনলে পুড়ে বারে বারে  
     লুঁষ্টিত হবে স্বপ্নসাধ।  
 আমি চি�ৎকার করে কাঁদিতে চাহিয়া  
     করিতে পারি না চি�ৎকার।  
     বুকের ব্যথা বুকে চাপায়ে  
     নিজেকে দিয়েছি ধিক্কার।

সেদিনের নৃশংস ঘটনাটির সাথে মায়ের মোকাবেলার সূচনা দিনের কথা। ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯। বরিশালে শীতের ঝাকঝাকে সকাল। শামসুল্লাহর বেগম পারল আট সন্তানের একজন সুখী মায়ের সকাল। যিনি চল্লিশ দশকের নারীদের জীবনের সব বাস্তবতার পথ পাড়ি দিয়ে বিংশ শতাব্দীর একজন প্রৌঢ় নারীতে উপনীত হয়েছেন। শৈশবের অমাত্ক সেই কোকড়া চুলের গোবেচারা পারল মেয়েটি সময়ের কমাঘাতে আজ পরিবর্তিত অবয়বের অধিকারী একজন পরিপূর্ণ মানুষ। তাঁকে খুঁজে পেতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না আপনজনদের। সুখী মানুষের চেহারা বলে কথা! আট সন্তানের অলংকার যার গলার শোভা। বড় নাতি তানিমের হঠাত বিয়ের সংবাদে এক তুলতুলে নরম আনন্দে শামসুল্লাহর বেগম পারল যেন ইদানিং একটু বেশী সুখী। সংসারের বামেলাও তাঁকে তেমন স্পর্শ করে না। সেজ ছেলে ও ছেলের বউ এর উপর বেশ ভরসা রেখে নিশ্চিতে সময় পার হয়ে যাচ্ছে। তবে ছেট ছেলের ঘন ঘন টেলিফোনের কারণে নাতির বিয়েতে ঢাকা যাবার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে বেশী গড়িমসি না করাই শ্রেয়-এমন চিন্তা ভাবনা তাঁর অলস সময়ের সঙ্গী হয়ে উঠছিল মাত্র। শীতের নরম রোদে উঠোনে বসে এ কথাই ভাবছিলেন তিনি। এমন সময় টেলিফোন। অনভীত একটি ঘটনা সেই সুখী মাকে জানানো শুরু হয়ে গেল সবার অজান্তে। যিনি এই শুরুর সূত্রপাত করেছেন তিনি আমাদের চাচাত ভাই বাদশা। আমাদের সবচেয়ে ছেট চাচা মুহম্মদ ইউনুস আলী

আখন্দ, যিনি সবচে' কম বয়সে সবার আগে ইন্তেকাল করেছিলেন, তার অনাথ ছেলেটি আবার তত্ত্বাবধানে এবং আমার মায়ের মেহের আঁচলে বড় হয়েছিল। সেই বাদশা সর্বপ্রথম মাকে টেলিফোনে জানিয়েছিল বিডিআর এ ভয়াবহ কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে। সেজভাইয়া বেলা এগারটাৰ দিকে এ ভয়াবহ খবরটা জেনে গেলেও নিজের মনেই চেপে রেখেছিলেন। গোপন করেছিলেন সবকিছু মায়ের কাছে। কিন্তু দুপুরের দিকেই মা জেনে গেলেন শুধু এইটুকু যে, বিডিআর সদর দণ্ডের গোলাগুলি হচ্ছে। মায়ের মনে দৃঢ় বিশ্বাস বিডিআর এর মত নিরাপদ স্থান ঢাকা শহরে দ্বিতীয়টি নেই। এই নিরাপদ স্থানে তাঁর ছোট ছেলেটির কোন বিপদের সম্ভাবনাই নেই। বিডিআর এর নিরাপত্তা প্রাচীর ভেঙে ভিতরে ঢুকে কেউ তাঁর ছেলের কোন সামান্য অনিষ্টও করতে পারবে না- পারা সম্ভবও নয়। কিন্তু আমার মায়ের বোধশক্তির বাইরে ছিল যে বিডিআর এর ভিতর থেকেই কেউ তাঁর ছেলের অনিষ্ট করতে পারে। টি,ভি র ব্ৰেকিং নিউজ মায়ের মনে ধীরে ধীরে দুর্ঘটনা ঘটার বিশ্বাস এনে দিয়েছিল। জায়নামাজে বসে মা দু'হাত তুলে শুধু সর্বশক্তিমান আল্লাহ কাছে সাহায্য চাইতে থাকেন। ছেলের ছবি দেখে দেখে আশায় বুক বাঁধতে থাকেন, মনকে হাজার কথা বলে সাজ্জনা দিতে থাকেন যে তাঁর সন্তানের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়, পরের দিন ভোর হয়। বৃহস্পতিবার চলে যায়, শুক্রবার আসে। ছেলের খবরের আশায় অপেক্ষারত মা বুকের ভিতর অলঙ্কুণে কোন কিছুর নড়াচড়া অনুভব করেন। মাঝে মাঝে নিষ্ঠক হয়ে পড়েন। আবার প্রশ্নের পর প্রশ্নে অস্থির করে তোলেন পারফল ভবনে চলে আসা আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীকে। তাদের চোখেও প্রশ্ন আর বুকে কান্নার জমাট যন্ত্রণা। কুটুর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তার ভাল মন্দ কোন খবরই তো পাওয়া যাচ্ছে না। সেজভাইয়া আর ভাবী যেন বোৰা। তাদের একমাত্র মেয়ে আন্তিকা নূর ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে শূন্যে। সেই মালেক রিঙ্গাওয়ালা যাকে মায়ের ছোট ছেলেটি একটি মোবাইল কিনে দিয়েছিল, তার চোখ শুধু মাটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে যেন বলতে চায় এ হতে পারে না। এমন লোকের কিছু হতে পারে না। সেতো মানুষ নয়, অন্য কিছু। সে গরীবের বন্ধু। সে সবার বন্ধু।

সময়ের সময় নেই বসে থাকবার। শনিবার এল। মায়ের হাতে সোনাভাই এর ছবি। ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, “তুই তো আমাকে ঢাকা যাবার কথা বললি,” “ঢাকা যেয়ে তোকে দেখতে পাবতো” “দৱবার হলে তোর ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে আমাকে যে থাকতোই হবে।”

“দরবার হলে ছেলে আর ছেলের বট এর হাত ধরে রাজার বেশে তুই বেরিয়ে আসবি তো”। “তাই যদি হবে, তবে দরবার হলে এত রক্ত কেন?” “এত রক্ত কোথা থেকে এল?” “তোর কোথাও লাগেনি তো”। এসব কথা নিজের সাথেই বলা হল মায়ের। বাড়ীময় শুধু লোক আর লোক। কিন্তু কেউ তো কোন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না। কারণ উত্তর দেবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। শনিবার সব ফয়সালা হয়ে গেছে। সবাই সব কিছুর উত্তর পেয়ে গেছে শুধু হতভাগ্য ছেলেটির মা ছাড়া। টি,ভি বন্ধ করে রাখা হয়েছিল কৌশলে। শিশুর আদরে মাকে অনেক যত্নে ঘুম পাড়ানো হ'ল। খুব ভোরে সেজভাইয়া মাকে নিয়ে রওনা হবেন ঢাকা, ছোট ভাইয়ের শেষ বিদায় অনুষ্ঠানে। এরকম প্ল্যানের কথাই ঢাকা থেকে জানান হল সেজ ছেলেকে। শুধু সেই সুখী মায়ের আর জানা হ'ল না তাঁর ছোট ছেলের প্রাণহীন হয়ে যাবার নির্মম ঘটনা।

এক লহমায় সব প্ল্যান ছারখার হয়ে গেল। খুব ভোরেই মাকে পাওয়া গেল অচেতন অবস্থায়। বরিশাল থেকে ঢাকা রওনা হওয়া হ'ল না। ডাক্তার এল। হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে মাকে। জরুরী এবং খুবই তাড়াতাড়ি। অসহায় সেজ ছেলে। একদিকে ছোট ভাইয়ের মৃত্যু শোক অন্য দিকে অসুস্থ মা। তিনি বোন ঢাকা থেকে রবিবার রওনা হলাম বাসে বরিশালের উদ্দেশ্যে। দুপুর নাগাদ বরিশাল পৌছেই অসুস্থ মাকে নিয়ে ছুটলাম বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বড় কঠিন সে সময়, বড় দুঃসহ সে সময়, বড় স্বার্থপর সে সময়, কোন কিছুই যেন ছাড় দিতে জানে না সময়। বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ, বড় পরিচিত, বড় আপন। এখানে মেজ ছেলের ডাক্তার হওয়া, এখানে মেজ ছেলের ডজনখানেক ডাক্তার বন্ধু। ছোট ছেলের তিন মাসের ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা, তাও এখানেই। মেজ ছেলের ডাক্তার বন্ধু ডাঃ আতাউর রহমান আমাদের চুনু ভাই ছেলের মমতায় মাকে আগলে নিলেন। ডাঃ গোলাম মাহমুদ সেলিম, বিভাগীয় প্রধান মেডিসিন, ডাঃ মোঃ জাকির হোসেন, ও ডাঃ ইমরান কায়েসসহ আরো অনেকে মায়ের জন্যে নজিরহীন সেবার নজির রেখে আমাদের মনে সারা জীবনের জন্য অল্পান হয়ে থেকে গেলেন। আমাদের পরিবার তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। দুই দিন মেডিক্যালে প্রায় জ্ঞানহীন থাকার পর ডাঃ সেলিমের নেতৃত্বে বোর্ড গঠন এবং ত্রেন হেমোরেজে অসুস্থ মাকে জরুরী ভিত্তিতে সিএমএইচ এ রেফার করার সিদ্ধান্ত আমাদের জানিয়ে দেয়া হ'ল। মাকে নিয়ে ঢাকা আসার কঠিন প্রস্তুতি। কোথাও এ্যম্বুলেন্স নেই। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন খোকন ভাই, নীলা ভাবী। আমাদের প্রতিবেশী। কাশ

ফুলের ছোঁয়ার মত তারা জীবনকে শান্ত করেছিল। বেহশি অবস্থায় সারাটা পথের ধকল বয়ে মাকে নিয়ে সেই কেওড়াকান্দি পৌছে যখন ফেরীর জন্য হাপিয়েশ অবস্থা, তখন কোথা থেকে ফেরীঘাটে ফেরী উপস্থিত আমাদের অসুস্থ মা শামসুন্নাহার বেগম পার্ল এর জন্য। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী এর নির্দেশে সেই সময় ফেরী ঘাটে ফেরী ঠায় দাঁড়িয়েছিল। মন্ত্রী মহোদয়ের সেই আনুকূল্য আমাদের বুকের মোচড়ানো ব্যাথার মধ্যখানে ছিল ক্ষণিকের বরিষণ ধারা। তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ভাইয়ের মৃত্যুতে তাঁর দেয়া শোকবাৰ্তাটিও আমি স্বত্ত্বে তুলে রেখেছি। এ দুঃসহ সময়ে সহকর্মী কাজল, সোহেলী, আফতাব ভাই, আফিয়া, সেলিমা আপা, জুলেখা আপার টেলিফোনে ভেসে আসা উদ্ধিগ্ন কর্তৃপক্ষের শুনে মনে হয়েছিল আমি একা নই। আমার দুঃখ সবার দুঃখে পরিণত হয়ে গেছে।

সিএমএইচ-এ মাকে নিয়ে এলাম সন্ধ্যায়। এই সিএমএইচ তো সোনাভাই এর জায়গা। সবাই আর্মি পোশাকে সজ্জিত। ফিটফাট। কিন্তু সোনাভাই কোথায়? তার হাঁক ডাক শোনা যাচ্ছে না কেন? মায়ের জন্য তার অস্থিরতার কোন প্রকাশ নেই কেন? এত নিরবিলি কেন সব কিছু। যাকে ছাড়া একদণ্ড চলে না আমাদের, সে কোথাও নেই। প্রতিটি কাজেই যাকে কাছে পাই, সে পাশে নেই। চারিদিক শূন্য। এদিক ওদিক চর্তুদিক তাকাই। মায়ের এ বিপদে সোনাভাই কোথায় লুকিয়ে রইলেন। যিনি মায়ের সামান্যতম অসুস্থিতায়ও স্থির থাকতে পারতেন না, ঔষধ খাওয়ায় কোন ভুল হলে টেলিফোনে তার হাজার জেরার মুখে মা অসহায় হতেন, যিনি মায়ের ব্যাপারে সবচেয়ে সচেতন। আজ মায়ের এই মুমূর্শ অবস্থায় সেই ছোট ছেলে পাশে নেই। মায়ের আজ এ হাল তার কারণেই তো। সে থাকল না বলেই তো আজ আমরা বিপদগ্রস্ত, অসহায়। আমাদের এত দায়িত্বার মাথা থেকে সরিয়ে নেবার কেউ নেই। ভাইয়া এলেন কানাডা থেকে ছোট ভাইয়ের অকাল মৃত্যুর খবর পেয়ে। অসুস্থ মায়ের শিয়ারে বসে সান্ত্বনার সব ভাষা হারিয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকলেন ভাইয়া। আমাদের সবার বড় ভাই। সবার ছোট ভাই আর রইলেন না আমাদের মাঝে। হারিয়ে গেলেন চিরতরে।

তারপরও সময় সব ঠিক করে দেয়। সময় দুঃখ কষ্টের যত্নণা ভুলিয়ে দেয়। তাই মহান আল্লাহর অসীম কৃপায় মা মরণের সাথে যুদ্ধ করে ফিরে এলেন আমাদের মাঝে। আমরা মাকে ফিরে পেলাম। তবে পুরোপুরি সুস্থিতা আর

কোনদিন বোধ হয় সম্ভব নয়। ছোট ছেলের মৃত্যু শোকের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে মা বেঁচে থাকুন এবং পিতৃহারা সন্তানদের মাঝে খুঁজে ফিরুক তাঁর প্রিয় সন্তানের মুখখানি। সরকারের সাহায্য সহযোগিতায় আবার পথ চলতে শুরু করল সেই বিধিস্ত পরিবারটি। শুধু তিনি সন্তানের বুকের মধ্যে বাবার শূন্যতা আর অভাব থেকে যাবে অনন্তকাল, যে বুক এ জীবনে আর কোনদিন ভরাট হবার নয়। স্বামীর শৃঙ্খল নিয়ে বৈধব্যের কষ্ট সহ্য করবেন তার সহধর্মীনী মুনমুন আখতার। এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ছোট ছেলের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হল ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০১০। এখনো সব ঘটনা, সব দুঃখ ও যন্ত্রণার ক্ষতিহান কাঁচা দণ্ডনগে। সে ক্ষতিহান থেকে রক্ত ঝরতেই থাকবে।

আট.

আমার মায়ের জীবনী নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমধর্মী এবং সংগ্রামী। বারিশালের অদূরে চরহোগলার নানাবাড়ীর আভিজাত্যের ফাঁক-ফোকর গলিয়ে সমবয়সী একদল ভাইবোন, মামা ও খালাদের নিয়ে গ্রামীণ ছায়া সুশীতল নেসর্গের কোলে বাধাহীনভাবে বড় হতে থাকাকালীন সময়ে মাতৃহীন হয়ে যাবার পর আমার মায়ের জীবনের গল্পটা তাঁর বয়সী অন্য পাঁচজনের মত আর স্বাভাবিক থাকল না। মাতৃহীন ছোট তিনি ভাইবোনের মায়ের শূন্যহান পূরণের সংগ্রাম দিয়ে তাঁর সংসার সমুদ্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই যাত্রায় আমার মায়ের সময় ও ঠিকানা পরিবর্তন হলেও দায়িত্বের পরিবর্তন আসেনি। ছোট ভাই বোনদের লালন পালনের দায়িত্ব পালন করতে করতে তিনি নিজের সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন। মা নিজের সংসারের একান্ত দায়িত্বের পাশাপাশি পশ্চাতে ফেলে আসা ভাইবোন ছাড়াও শঙ্গুরবাড়ীর দায়িত্বালী পালনের সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন নিরন্তর। পিঠেপিঠি আট সন্তানের বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে আমার মায়ের জীবনের কঠিন সময়গুলো অতিক্রান্ত হয়ে যেতে থাকল। মরণভূমির শুক্র প্রাণের সবুজের হাতছানি বদলে দিতে থাকে জীবনের অর্থ। সন্তানদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার মাঝে আমার মা খুঁজে পান বেঁচে থাকার নতুন প্রয়োজন। মায়ের প্রিয় গল্প সুলেখা দেবীর “ওরা বড় হয়ে গেল” এর মমার্থ নতুন করে উপলব্ধি করতে থাকেন মা। একদা যে সংসারে ছেলেমেয়েদের কলরবে নিজের একান্ত সময় বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিলনা, পারুলের সেই ভরপুর সংসারের নিষ্ঠদ্রুতা আজ কেমন ভারী করে তোলে মন। তারা সব বড় হয়ে পারুল ভবনের আঙিনা থেকে ছড়িয়ে গেল দূরে, বহুদূরে।

সবার বড় সন্তান মুস্তাফা মাহমুদ (খসরু) ছাত্র জীবনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য রাশিয়ায় গমন করেন। মক্ষের লুবুশা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম,এ ডিপ্রী এবং পরবর্তীতে পি,এইচ ডি লাভ করেন। তিনি রাশিয়া যাবার ঠিক আগে ঢাকা বেতারের একজন তালিকাভুক্ত সঙ্গীত শিল্পী হ্বার অপেক্ষায় ছিলেন। মায়ের এই বড় সন্তানটির এখনো গানের সুনাম রয়েছে।

মায়ের মেজ সন্তান মুস্তাফা মাহবুব (নসরু) তিনিও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম,বি,বি এস পাশ করেন। পরবর্তীতে ঢাকার পিজি হাসপাতাল থেকে এফ সি পি এস (শিশু) ডিপ্রী লাভ করেন। তিনি যুজ্বরাজ্যের ফেলোশীপ ইন চাইল্ড নিউরোলজি ডিপ্রীসহ ইরান ও নাইজেরিয়ায় চিকিৎসক হিসেবে ঢাকুরীরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা শিশু হাসপাতালে সহকারী অধ্যাপক (চাইল্ড ডিভালগমেন্ট এন্ড নিউরোলজি ইউনিট) হিসেবে কর্মরত।

মুস্তাফা মাসুদ (সেলিম) মায়ের তৃতীয় সন্তান। মায়ের সবচেয়ে মেধাবী সন্তান। তিনিও বড় দুই ভাইয়ের মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি এমএসএস ও এমএড ডিপ্রী লাভ করেন। তিনি বর্তমানে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে বরিশাল সদর উপজেলায় কর্মরত। ১৯৯৬ সনে প্রেস্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে তিনি জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। শিক্ষকতা পেশাকে ভালবেসেই তিনি আজীবন এ পেশায় নিয়োজিত থাকতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

মায়ের সবচেয়ে কনিষ্ঠ ছেলে শামসুল আজম (কুষ্টু)। তিনিও অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছাত্র। খেলাধরের একজন খুদে প্রতিভা হিসেবে তিনি পটুয়াখালীর জুবিলী স্কুল থেকে রাশিয়ার আর্টেকে ভ্রমণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। জীবনের সব পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমিশন প্রাপ্ত হন ১৯৮০ সনে। সেনাবাহিনীর লেফট্যানেন্ট কর্নেল পদে থাকাকালীন ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সনে পিলখানা বিভিআর কর্তৃক সেনাবাহিনীর অফিসারদের হত্যাকাণ্ডে মায়ের এই অসাধারণ মেধাবী ও মা দরদী সন্তানটি সকলকে ছেড়ে পরলোকে চলে গেলেন।

চার ভাইয়ের পর আমরা যময দুই বোন মীনা আর রীনা। মীনা পারভীনও লড়ন থেকে Public Sector Audit & Accounting বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেন। আমি যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ওয়েল্স থেকে এম,এস,সি ডিগ্রী লাভ করি এবং ১৯৯৯ সনে দিল্লীর Institute of Applied Manpower Research (IAMR) থেকে Human Resource Planning and Development কোর্সে অংশগ্রহণ করে দুটো স্বর্ণপদক অর্জন করি। বর্তমানে আমরা দুজনই বি,সি,এস (প্রশাসন) ক্যাডারে সদস্য। মীনা পারভীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব এবং আমি উপ-সচিব, এই মুহূর্তে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেইনিং সেন্টারের পরিচালক পদে কর্মরত আছি।

মায়ের সেজ ঘেয়ে রুক্ষী পারভীন, মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে মেধা তালিকায় মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স ও এম,এ ডিগ্রী লাভ করে। বি,সি,এস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে সদস্য হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করেন। তবে পারিবারিক জীবনে অধিকাংশ সময় বিদেশে অবস্থান করতে হয় বলে তার পক্ষে চাকুরী করা সম্ভব হয়নি।

মায়ের সবচেয়ে কনিষ্ঠ ঘেয়ে বেবী পারভীন বি,সি,এস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন সদস্য। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনসিটিউট থেকে এমএসএস ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে এমএসএস ডিগ্রীপ্রাপ্ত। বর্তমানে বেবী পারভীন সিনিয়র সহকারী সচিব পদে কর্মরত।

মুহম্মদ মুসলিম আলী আখন্দ, আমাদের আবু। তিনি আগাগোড়া একজন সৎ, নিবেদিত ও আদর্শ শিক্ষক। তিনি ১৯৪৩ সনে ‘শিক্ষা’ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ (শাস্তিপুর, নদীয়া) থেকে সাহিত্যবিনোদ উপাধি লাভ করেন। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, লেখক 'এবং সমাজসেবী ছিলেন। তিনি খুলনা বেতারের একজন গীতিকার ছিলেন। স্বনামধন্য লেখক ড. বদিউজ্জামান তাঁর “এই ঝুঁতুবদলের পথপ্রাপ্তিকে” শীর্ষক বইতে মুঃ মুসলিম আলী সম্পর্কে

যে মন্তব্য রেখেছেন তা উন্নত করছি “মোসলেম আলী আখন্দের লেখা আমি আগেও পড়েছি, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়’ হবার পর আগহ আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল, ফলে তার আরো অনেক লেখা পড়ার সুযোগ হয়েছিল। তার লেখার মধ্যে রাজনীতির অধিস্থর ছিল, আরো স্পষ্টায়িত করলে বলতে হবে, প্রগতিশীল রাজনীতির অত্যন্ত স্বচ্ছ উপলক্ষ ও সত্যভাষণ ছিল। কোনো কোনো কবিতা প্রায় অগ্রিমস্থলিঙ্গের মত মনে হত। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের পর আমার এ ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।”

এই আট সন্তানের লেখাপড়া আর চাকুরী জীবনের সাফল্য থেকে সহজেই অনুমান করা সম্ভব যে, আমার মা শামসুন্নাহার বেগম পারল একজন মা, যিনি সংসার ও সন্তানদের গড়ে তোলার সংগ্রামে সার্থক একজন মা। তিনি শুধু নিজের সন্তানই নয়, বরং নিজের তিনি ভাই বোনদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন।

আমার মায়ের ছোট বোন নূরন্নাহার বেগম (মণ্ডু) বি এড ডিহী অর্জন করে ভোলা সরকারী গার্লস স্কুলে দীর্ঘদিন সহকারী প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে চাকুরী শেষ করে বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত করেছেন।

ভাই খোল্দকার সিরাজুল ইসলাম (আবু) লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে পি.এইচ.ডি ডিহী লাভ করেন। তিনি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে বহুদিন চাকুরী করেছেন।

খোল্দকার শফিকুল ইসলাম (কবীর) আমার মায়ের সর্বকনিষ্ঠ ভাই। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি এস, এস, সি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু পরে ভাগ্য বিড়ম্বিত এ ভাইটি ১১ই জুন, ২০০৭ সনে একবার বৎসর বয়সে ইন্ডোকাল করেন।

আমার মায়ের কথা লেখার এ প্রয়াস ধীরে ধীরে তাঁরই আপনজনের কথায় পরিণত হয়ে গেল। তাঁর প্রিয়জন যাঁরা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের আর তাঁর প্রিয় সন্তানদের কথার মালা দিয়েই এ রচনা ভরপুর। আমার মা তাঁর সুদীর্ঘ পঁচাত্তর বছরের সূচনাকাল থেকে মধ্যহের দিনগুলো অতিক্রান্ত করে আজ প্রাণিক বয়সসীমায় উপনীত হয়েছেন। গোধুলীর রাঙা মেঘের খেলায়

তিনি তাঁর পশ্চাত জীবনের স্মৃতির পাতা হাতড়ে বেড়ান, ফেলে আসা দিনের শত কথামালা তিনি জানাতে চান প্রিয়জনকে, কখনো কখনো অনেক কথা হারিয়ে ফেলেন নিজের অজান্তে। এত কথা, ব্যথা, যা কিছু ঘটে গেছে এ জীবনে সব তো মনে রাখাও দায়। নিজের সাথে নিজের বোঝাপড়ার এ আস্তসাক্ষাৎকারের সংগ্রামে তিনি ক্লান্ত। তাঁর ভিতরের সংলাপগুলো যেন দ্রুত হারিয়ে যাবার জন্য অস্থির। আমার মায়ের এহেন একটি সময়কালে আমি তার সহযোগ্য হয়ে তাঁর স্মৃতির পাতা থেকে কিছু কথা, কিছু ঘটনা, রেখে যেতে চাই পৃথিবীর কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে। নতুন প্রজন্মকে আরো জানিয়ে দিতে চাই আমার সুখী মায়ের নিমেষেই পৃথিবীর একজন সবচেয়ে দুঃখী মা-এ রূপান্তরের সেই হৃদয়বিদ্রক কথা। আমার এই দুঃখী মায়ের বর্তমান ভূবনকে আলোকিত করার জন্য আমার এ উদ্যোগ। ইহজাগতিক ভোগ বিলাস, আরাম আয়োশ, বস্তুগত প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তি সব কিছুর উর্ধ্বে অবস্থানরত আমার দুঃখী মায়ের নির্মল নির্ভেজাল আনন্দের জন্য এমন উদ্যোগের প্রয়োজন অনিষ্টীকার্য। ২০০৪ সনে আমার মরহুম আবাবার জীবনের শেষ দিনগুলো তাঁর সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ভরিয়ে দিতে আকার লেখা “কবিতার দেশে বেলো শেষে অবশেষে” বইখানি ছাপিয়ে আকার হাতে দিয়েছিলাম। তখন তাঁর মুখে যে অপার আনন্দ, উৎসাহ আর আবেগ দেখেছিলাম, তা অন্তরে আজও চিরস্মায়ী হয়ে আছে। জীবনের শেষ প্রান্তে পার্থিব জীবনের সব কিছুই যেন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। জীবনের এ অবোধ সময়ে বন্ধুবাঙ্কবের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য, ছেলে মেয়ের প্রিয়মুখগুলোই যেন সবচেয়ে আনন্দের উৎস হয়ে দেখা দেয়। নিজের সৃষ্টির মাঝে পৃথিবীতে অনন্তকাল বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে এসব মানুষ, যাদের মনের বাস ইতিমধ্যেই পরিব্যঙ্গ হয়েছে পরকালে।

জীবনের অতি সাধারণ সংজ্ঞা হ'ল একটি নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে পৃথিবীতে বাস করা, বেঁচে থাকা। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ধারাবাহিকতায় জীবনের সেই নির্দিষ্ট সময়কাল অতিবাহিত হতে থাকে। একজন মায়ের অতিক্রান্ত সময়ের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে তার বেঁচে থাকার ঘটনাপ্রবাহের অলিগলি পরিভ্রমণের চেষ্টা করা হয়েছে এ রচনায়। শামসুন্নাহার বেগম পারল নামের এই মা শৈশব থেকে যৌবনের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে একটি উৎকর্ষাহীন সাধারণ জীবনে সুখী ছিলেন মাতৃহীন ছোট ভাইবোনদের বড় করে তোলার নিরলস পরিশ্রমে। সুখের নীড় বাঁধার স্বপ্নে স্বপ্নবিলাসী হয়েছেন অষ্টাদশীর সময়টিতে। বিবাহিত জীবনের বাস্তবতা প্রসারিত হয়েছে মধ্যবিত্ত সংসারের নিত্যদিনের অসীম সমস্যার সাথে

বোঝাপড়ার যুদ্ধ করে। জীবনসঙ্গী হিসেবে একজন লেখক ও শিক্ষানুরাগীর ব্যাপক উদারতা ও শৈলিক সাহচর্যে জীবন পরিবেষ্টিত থেকে থাকলেও পঞ্চাশ দশকের সমাজ কাঠামোতে নারীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য, কুসংস্কার, বিধি নিষেধ ইত্যাদি অনাচারের প্রভাব থেকে হয়তো কখনো নিঃস্ফূর্তি পাননি তিনি। সব কিছু অতিক্রম করেই জীবনের এই দীর্ঘপথ অমগ্নের দু:সাহস দেখিয়েছেন, অসাধারণ দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন।

জীবনের এতসব ঘাত প্রতিঘাত জ্ঞান করে দিয়ে তিনি মা হলেন। শুধু মা নন, তিনি হলেন রত্নগৰ্ভ মা। অসীম ধৈর্য, সহ্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে তিনি সন্তানদের বড় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে করলেন নির্বিঘ্ন ও সাবলীল। বড় হয়ে ওঠা সন্তানদের মাঝে তিনি খুঁজে পেতে থাকেন নির্ভরতা। সন্তানদের আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইলেন অতি নিকটে, নিজের একান্ত সন্তায়। তাঁর জীবনে সন্তানদের আঁকড়ে রাখার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বহুবার, বহুভাবে। শুধুমাত্র সন্তানদের মঙ্গল কামনায়ই ব্যস্ত থাকেননি এ মা। তাঁর সাহায্যের হাত প্রসারিত হয়েছে এতিম, দুঃখী ও অসহায় মানুষের সেবায়। তাঁর অনুপ্রেরণায় সম্ভব হয়েছে বদরপুর ধার্মের আমূল পরিবর্তনের বর্তমান চিত্র। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন আমাদেরই নিকট আত্মীয় স্বজনের ছেলেমেয়েরা। তাঁর ভালবাসায় সুরভিত হয়েছেন পাড়া প্রতিবেশী। ধার্মীণ আত্মীয় স্বজন তাঁকে বসিয়েছেন শ্রদ্ধার আসনে। পশ্চাত জীবনের সব অপূর্ণতাকে পিছনে ফেলে জীবনের হিসেব নিকেশের চূড়ান্ত ফলাফলে তিনি সার্থক মা, পৃথিবীর অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ সুখী মা কখনো সুখ দুঃখকে একত্রে ধারণ করেই। আফসোস বা না পাওয়ার বেদনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি কোনভাবে।

সেই সুখী মা আর সুখী রইলেন না ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ সালের পর থেকে। বিন্দু বিন্দু করে গড়ে তোলা সুখের সাগর নিমেষেই শুকিয়ে গেল একটি বুলেটের কারণে। কোন শক্তিই পারল না সেই বুলেটের গতিপথ রোধ করতে। বারে গেল কনিষ্ঠ ছেলের সোনার জীবন। কি অপরাধে এমন হ'ল-এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কেউ সেই দুঃখী মাকে। কতটা নির্মমতা ছিল সে ঘৃত্যতে-কেউ জানাল না তাঁকে। একটি মায়ের সুখের জীবন মরণভূমি করে দিল যারা তারাও কোন মায়ের সন্তান হয়ে থাকবে। অসুখী হয়ে গেল সকল মা, সকল মানুষ। অসুখী হ'ল সারাদেশের মানুষ। অসুখী হ'ল মাত্তুমি বাংলাদেশ, আমার মায়ের দুঃখ সুখ কান্না হাসির সঙ্গে সকল মায়ের চিরস্মন দুঃখ সুখ কান্না হাসি একত্রে মিলে গেল।